বালিকার পাঠ্য পুস্তকে মহৎ লোকদিগের জীবনের Nagative side ও কলঙ্কের বিষয় যত অল্প বলা যায়, বরঞ্চ না বলিলেই ভাল হয়...উহাতে বালকদিগের মনে মহৎ জীবনের :আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। তদ্বিপরীতে আমরা বলি যে, ছেলেদের পাঠ্য মহদ্‌-জীবনীতে মহাপুরুষদের Positive side এবং তাঁহাদের মহত্ব লাভ করিবার নিগূঢ় তত্ত্ব ও উপায়সমূহ প্রকাশ করিলে ছেলেদের বেশী উপকারের সম্ভাবনা। এই আলোচ্য গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভক্তির এবং ভগবদ্‌-ভক্তির যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের বড়ই মনোরম লাগিল।

শ্রুতিস্মৃতি।—স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বি. ই. এম. আর. এ. এস বিরচিত। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক শ্রীঅবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। ৫০নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

গ্রন্থকার আমার পরম বন্ধুগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অতি অল্পকালের পরিচয়েই তিনি তাঁহার অকৃত্রিম অমায়িকতা ও সৌহৃদ্যগুণে আমার মন সহজেই হরণ করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে, বোধ হয় ৪৫ বৎসরে, তিনি যে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তির একটি ফটোগ্রাফ দেওয়া হইয়াছে। তাহা দেখিয়া আজ অনেক-দিন পরে আমার বন্ধুবিয়োগজনিত শোক আবার উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি "শ্রুতিস্মৃতি" যখন লিখিতেছিলেন, তখন আমাকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর আমি সেই লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সক্ষম হই নাই। আজ তাঁহার পুত্র সেইগুলি অল্পে অল্পে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। এই সকল শ্রুতি-স্মৃতি হইতে নব্য বঙ্গের ইতিহাস-রচয়িতাগণ অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীমান অবনীমোহনকে অবশিষ্ট অংশগুলি যথাসত্বর প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষায় মুক্তি।—শ্রীতারাকুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক—বালী বঙ্গশিশু-বিদ্যালয়।

ইহাতে ভাবিবার অনেক কথা আছে। আমাদের মনে হয় ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিলেই শিক্ষায় মুক্তিলাভ সহজ হইবে।

[দ্রষ্টব্য—স্থানাভাবে অনেকগুলি পুস্তকের সমালোচনা এসংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিল না। আশা করি, পুস্তকদাতাগণ বিলম্বে সমালোচনা প্রকাশের জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।]

পত্রিকাপরিচয়।

THE MESSAGE—এই পত্রখানি গোরখপুর হইতে মাসে মাসে প্রকাশিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র—এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য ভূমিতেও ভারতের ব্রহ্মবাদের সুগন্ধ বহন করিয়া লইয়া যায়। ইহা সদানন্দ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের ভক্তি ও নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি অতি সামান্যভাবে ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন ইহা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া সংসারের পাপতাপদগ্ধ জনসাধারণকে ছায়া ও সুস্বাদু ফলদানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমরা ইহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করি-তেছি। এই পত্রখানি কোনও সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহাতে নিরপেক্ষভাবে সকল ধর্ম্মেরই মতামত আলোচিত হয়। প্রতি মাসে ইহার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত সত্যধর্ম্ম ও তদনুকূল দর্শন, বিজ্ঞান ও নীতি-বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে বিভূষিত থাকে। ইহার মূল্যও যৎসামান্য—বাৎসরিক ১৲ টাকা মাত্র। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইংরাজী মাসিক পত্রিকা যে এত স্বল্প মূল্যে বিতরিত হইতে পারে, তাহা আমাদের :জ্ঞানগোচর ছিল না। আমরা ভারতের গৃহে গৃহে ইহার সবল ও প্রাণপ্রদ বাণী প্রচার কামনা করি। ভগবান কালী-প্রসন্ন বাবুকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রাখুন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১—এই সংখ্যা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রভৃ-তিতে পূর্ণ। কোন্ প্রবন্ধটী ছাড়িয়া কোন্ প্রবন্ধের উল্লেখ করিব, তাহা বুঝিয়া উঠি না। স্বামী রামদাস কর্ত্তৃক লিখিত Religious To leration বা 'ধর্ম্মে উদারতা' প্রবন্ধ বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা খাটি সত্য কথায় পূর্ণ। শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের লিখিত The Religion of God Vision বা 'ভগবদ্ দৃষ্টিমূলক ধর্ম্ম' প্রবন্ধ ধর্ম্ম-প্রাণ প্রবীণ লেখকেরা ভাবুকতায় মাখা। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত The Gita and the Gos-pel in the Present day বা বর্ত্তমান যুগের 'গীতা ও বাইবেলের তুলনাত্মক আলোচনা' পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুলিখিত। সন্ন্যাসী জ্ঞানানন্দ লিখিত The Dancing Siva বা 'শিবতাণ্ডব' কবিতাটী আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল। শ্রীযুক্ত টি, এল ভাসওয়ানি লিখিত The vision of the Rishis বা 'ঋষিদিগের দৃষ্টি' উচ্চাঙ্গের ভাবুকতায় মাখা গদ্য-পদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, এই পত্রিকাখানি কিরূপ উদারভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং কিরূপ উচ্চাঙ্গের লেখকদিগের সহায়তা লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রবাণী—৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৮ সাল। এই সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধীর লিখিত "আত্মসংযম বনাম স্বেচ্ছাচার" প্রবন্ধের অষ্টম কিস্তি বাহির হইল। বিষয়টী জন্ম-নিরোধসম্বন্ধীয়। আমাদের বহু শতাব্দীগত দাস-মনোভাবের কারণে এ বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য জাতির মনোবৃত্তির অনুসরণে ধাবিত হইয়া অধিক হইতে অধিক-তর দুর্নীতির পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইতেছি। এই কারণে ইহার কতকটা খোলাখুলি আলোচনা আব-শ্যক হইলেও আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে এবং আমরা ইহা ইচ্ছা করি না। যাঁহারা এবিষয়ে বেশী খোলাখুলি আলোচনা করেন, আমরা দেখিয়াছি, অনেক স্থলেই তাঁহাদের সেই আলোচনা ভাল অপেক্ষা মন্দ ফলই অধিকতর প্রসব করে। আমরা বুঝিতে পারি না যে পাঠ-কেরা কি প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া এই সকল আলোচনা অনায়াসেই গলাধঃকরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর আমাকে এক চিকিৎসক বন্ধু Social Science নামক একখানি গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহার প্রথমেই আমার মনে পড়ে জন্মনিরোধের অনু-রূপ বিষয়সকল লিখিত ছিল। তাহা পড়িয়া এতই গ্লানি করিয়াছিল যে, আমি আর উহার পাঠে অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু এখন বালক যুবক বৃদ্ধ—এমন কি, বালিকা ও মহিলা সকলেরই মন এই পূতিগন্ধময় বিষয়ে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে যে, এই সকল বিষয়ে নরনারী অবাধে আলোচনা করিতে কুণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য প্রণালীতে জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা যে নিতান্তই পাপের কারণ, তাহা বলিতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা করিব না। ইহার সমর্থনে পণ্ডিতেরা যাহাই কেন বলুন না, অনেক বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রমাণাদি সহকারে দেখাইয়াছেন যে, ইহার ফলে পুরুষ ও রমণী উভয়েরই দেহ ও মন সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসের অভিমুখে ধাবিত হয়। পাশ্চাত্য প্রণালীর পরি-বর্ত্তে এদেশবাসীগণ যদি দাসমনোভাবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদিগকে শাস্ত্রভিত্তি সদাচার-সমূহের উপর দাঁড়াইবার উপদেশ দেন ও সেই পথে শৈশবাবধি পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে আমরা দৃঢ়তাসহকারে বলিব জন্মনিরোধ নিয়মিত হইবার সঙ্গে দেহ ও মন সবল থাকিবে। তাহা হইলে এখন-কার ন্যায় চলিবার পথে প্রতি পদে চসমাধারী ও কুব্জ দেহ বালক বৃদ্ধ ছেলেমেয়ে দেখিতে হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর উক্তির শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমা-দের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—"অব্যবস্থিতচিত্ততা, কঠিন এবং যে কাজে লাগিয়া থাকিতে হয় সে কাজে অনাসক্তি, শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষমতা, উৎকৃষ্ট আরম্ভেই বর্জ্জন, মৌলিকতার অভাব—আমাদের ভিতর সাধারণত দেখা যায়, ইহাদের বেশীর ভাগই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনার ফল। আমি আশা করি যুবকেরা একথা বলিয়া কখন আত্মপ্রবঞ্চনা করিবে না যে, সন্তান যদি উৎপন্ন না হয় তবে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়পরিচালনায় কিছুই যায় আসে না—তাহা দেহকে দুর্ব্বল করে না। বস্তুত দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া মানুষ যখন যৌন সঙ্গ করে, তখন যে শক্তি ক্ষয় হয়, তার চেয়ে ঢের শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে যখন জন্মনিরোধের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়পরিচালনায় নিরত হয়।" এই বিষয়ে ভারতীয় ঋষিমুনিদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই—"জীবনং বিন্দুধারণাৎ মরণং বিন্দুপাতনাৎ"।

মুকুল—ভাদ্রসংখ্যা, ১৩৩৮ সাল। সম্পাদিকা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী বি-এ, ২৯৪নং দরগা-রোড, পোঃ পার্ক সার্কাস। বার্ষিক মূল্য মাশুল ২।/•

রামধনু—ভাদ্র সংখ্যা ১৩৩৮ সাল, ১৬নং টাউনসেণ্ড রোড হইতে সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৷৵•

আমরা যে কয়েকখানি বালকবালিকার পাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রাপ্ত হই, তন্মধ্যে 'মুকুল' একটি অপরটী 'রামধনু' উভয় পত্রেই বালকবালিকাদের সুখপাঠ্য প্রবন্ধ ও কবিতা থাকে। আমরা ছেলেমেয়েদিগকে এই দুইখানি পত্রের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকিতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মানবচরিত্র যাহার দ্বারা সুগঠিত হইয়া উঠে, এরূপ মহাপুরুষ-জীবনী ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ খুব সহজ ভাষায় লিখিত হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরি-মাণে থাকিলে ভাল হয়। তারপর যে বিজ্ঞানের আলো-চনায় বালকের মনে জ্ঞান ফুটিয়া উঠিতে পারে, সহজ-বোধ্য ভাষায় লিখিত এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অধিকতর স্থান পাইলে আমরা সুখী হই। আমরা এই সকল বালকপাঠ্য মাসিকপত্রের সাহায্যে দেশের ছেলেমেয়ে-দিগকে জ্ঞানে ও বিদ্যায়, চরিত্রে ও সদ্ভাবে গড়িয়া উঠিতে দেখিবার আশা করি।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।[স্মিলনী]—ভাদ্র মাস, ১৩৩৮ সাল; ২০নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

এই পত্রিকা দুই একমাসের মধ্যেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আয়ুর্ব্বেদের পারভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধটী বড়ই ভাল লাগিল, বিজ্ঞানা-লোচনার প্রাণ হইল পরিভাষা, পরিভাষা যত নিখুঁত হইবে, বিজ্ঞানও তত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে, লেখক ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে নার্ভ শব্দ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে,

মার্ত্ত অর্থে স্নায়ু করা উচিত নয়; কিন্তু কি করা উচিত সেইটী দেখাইলে ভাল হইত। আমরা অনুরোধ করি, তিনি প্রবীণ কবিরাজদিগের সহযোগে একটী সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা প্রস্তুত করিয়া এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকুন। ইহাতে চিকিৎসাসাহিত্যের যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হইবে, তাহা এক মুখে বলা অসম্ভব।

ইহার সম্পাদনভার শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ও শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের সুযোগ্য হস্তেই পড়িয়াছে। ইঁহাদের অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে আমরা বহু সাময়িক পত্রে পাঠ করিয়া আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতির কামনা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহা এদেশবাসী গৃহস্থের খুবই উপকারে আসিবে।

সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা—৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল। ৮সি, লালবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ৩৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয়ের পরিচালনে ইহা অষ্টম বর্ষে চলিতেছে দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। বলা বাহুল্য, ইহা আমাদের হস্তে পড়িলে সমস্তটাই সাগ্রহে পাঠ করি। সঙ্গীতের প্রতি সাধারণের বিশেষ আগ্রহ না জন্মিলে এই দুঃসময়ের যুগেও কেবল সঙ্গীতবিষয়ক একখানি পত্রিকার এরূপ সুন্দরভাবে পরিচালন অসম্ভব হইত। আলোচ্য সংখ্যায় "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" নামক সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধে সুযোগ্য লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, "তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা বাংলা সাহিত্যে খুব কমই হইয়াছে"। আমরা তানসেনের দুইখানি জীবনীপুস্তক বাল্যকালে দেখিয়াছি, তন্মধ্যে একখানির নাম মনে পড়ে "সঙ্গীত তানসেন"। এই গ্রন্থখানি সুলিখিত এবং তালমান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ বলিয়াই স্মরণ হইতেছে। লেখক ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট এই গ্রন্থ থাকা নিতান্তই সম্ভব। তিনি যদি উহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং তাহার সঙ্গে যতদূর সম্ভব তানসেনের গানগুলি সংযোজিত করিয়া সুলভ মূল্যে প্রকাশ করেন, তবে সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণের মহদুপকার সাধিত হইবে। "সঙ্গীতযন্ত্র ও অরকেষ্ট্রায় তাহার ব্যবহার" প্রবন্ধে অনেক যন্ত্রের নাম করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি Bandএর অরকেষ্ট্রারই উপযোগী; কিন্তু যে অরকেষ্ট্রার সেতার, এস্রাজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র বাজান যাইতে পারে, সেই অরকেষ্ট্রা ও তদুপযোগী যন্ত্রাদির নাম উল্লিখিত হয় নাই। স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনী তাঁহার স্বদেশবাসী সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান রমেশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত। উক্ত গায়কপ্রবর "যদুভট্ট" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রমেশবাবুর লিখিত জীবনীর মধ্যে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সহিত যদুভট্টের যে যোগ ছিল, তাহার বলিতে গেলে কোনই উল্লেখ নাই। আমার মনে পড়ে, বাল্যকালে, তখন আমার বয়স ৮।৯ বৎসর হইবে, যদুভট্টের নামে আমাদের পরিবারের সকলকেই মুগ্ধ হইতে দেখিতাম। যদুভট্ট আসিয়াছেন এবং তিনি গান করিবেন ইহাতে বাড়ীশুদ্ধ একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। তিনি শুধু সঙ্গীতে গুরুকল্প ছিলেন না, কিন্তু বীণ প্রভৃতি বাদনেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমায় যতদূর মনে পড়ে, বাড়ীর সকল লোক তাঁহার বীণ ও সেতার বাদন তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মুগ্ধকর্ণে শ্রবণ করিতেন।

আমার পিতৃদেব গুণীর সমাদর করিতে জানিতেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া যদুভট্টকে সমাজের গায়কের পদে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে আমার মাতৃদেবীকে পৃথক্‌ভাবে সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিবার জন্যও তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রমেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই ঠিক যে, তিনি অধিককাল একস্থানে থাকিতে পারিতেন না। আমাদের বাড়ীতেও থাকিবার কালে দুই দুইবার চলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তাহা তাঁহার ত্রিপুরায় যাইবার পূর্ব্বে। আমরা রমেশ বাবুকে অনুরোধ করি যে, যদুভট্টের ন্যায় সঙ্গীত সম্বন্ধে সিদ্ধ পুরুষের একটি বিস্তৃত জীবনী লিখিতে হস্তক্ষেপ করুন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত "ব্রহ্মসঙ্গীতের" অনেকগুলি গান তাঁহার দেওয়া সুর হইতে ভাঙ্গা। সর্ব্বশেষে কৃষ্ণকিশোর বাবুর নিকট আমাদের এই অনুরোধ, হালকা বা ভারী যে তালেরই হউক এমন সুর ও গান স্বরলিপিসহ প্রকাশ করুন, যেগুলি ঘরে পরিবারের সকলে মিলিয়া গাহিয়া ছেলেমেয়ে এবং বাটীর কর্তৃপক্ষ সকলেরই মনপ্রাণ ঊর্দ্ধমুখে অগ্রসর হয়।

ইহার ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। দেশের মহাপুরুষদিগের জীবনী যতই প্রকাশিত হইতে থাকিবে, দেশ ততই উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইবে। মিথ্যা ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাস পড়িয়া আমরা অনেক আদর্শ হারাইয়াছি। গবেষণা করিয়া যাঁহারা সেই আদর্শ পুনরুদ্ধার করিয়া দেশের ছেলেমেয়েদের সম্মুখে ধারণ করিবেন, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।—আমরা বিগত দুই সংখ্যা ধর্ম্মতত্ত্বে দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে আলোচনার জন্য গিরিধি-নিবাসী ডাঃ ভি, রায় অনেকগুলি প্রশ্ন এবং তৎসঙ্গেই তাঁহার বিবেচনা মত সেই সকল প্রশ্নের উত্তরও লিখিয়া দিয়াছেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে কতকগুলি একটু লঘুভাবের হইলেও অধিকাংশই practical অর্থাৎ সাধারণতঃ মানুষের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উদয় হইতে-পারে, সেই সমস্ত প্রশ্ন লিখিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই সকল প্রশ্নোত্তর দ্বারা ব্রাহ্মসাধারণ উপকৃত হইবেন।

ব্যবসাবাণিজ্য।—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ৯৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৫।৵৹ মাত্র। ইহাতে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষতঃ বীমাতত্ত্ববিষয়ে অনেকগুলি ভাল প্রবন্ধ আছে। আমরা কিন্তু চাই যে, practically কিভাবে ব্যবসাবাণিজ্যে হাত দিয়া দেশের ঋদ্ধি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এইরূপ প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রকাশ করা। ইহাতে পরীক্ষিত ফরমূলা দিয়া ইহার উপকারিতা বিশেষ বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে।

গৃহস্থমঙ্গল।—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-সংখ্যা। ৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

আমরা সম্প্রতি গৃহস্থ মঙ্গল একত্র প্রকাশিত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-সংখ্যা পাইলাম। বোধ হয় বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের আঘাত ইহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। যদি আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ একখানি পত্র বর্ত্তমান দুর্দ্দিনেরই উপযোগী। ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ "বাজে খরচ" প্রথম স্থান পাইবার উপযোগী। ইহাতে সত্যই অনেক সারকথা লিখিত হইয়াছে। বিলাতী নকল-নবিসী করিবার ফলে আমাদের দেহ-মন যে অচিরে জরাজীর্ণ হয়, পুস্তকাদিতে ও নিজেদের অভিজ্ঞতায় প্রতিপদে তাহার সাক্ষ্য পাইলেও আমরা সহজে ছাড়িতে পারি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার বাল্যকালে মুখ-হাত ধুইয়া প্রাতঃকালের আহার ছিল—ডিম, রুটী চায়ের পরিবর্ত্তে একধামা মুড়ি-মুড়কি; তিনি উহা ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে শেষ করিতেন। এইরূপ আহারাদির ফলে তাঁহার কখনও অম্বলের ব্যাম হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। বিলাস-ব্যসন দেশের যুবকদিগকে কিরূপ অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিই। এক আফিসে ১০৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী একদিন বিলাতী বার্ণিস জুতা ও বিলাতী ফুলদারী মোজা পরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল যে, আফিসের বড় সাহেব এরূপ দেখিলে বলিবেন যে, তিনি ঘুষ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কর্ম্ম থাকা কঠিন হইবে। তখন তিনি পরদিন অবধি আর উহা পরিয়া আফিসে আসিতেন না। প্রবন্ধের প্রত্যেক কথাটি খাঁটি সত্য। আমরা উহা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। আলোচ্য সংখ্যায় টোট্কা-চিকিৎসামূলক প্রবন্ধের ভাগ একটু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ প্রবন্ধ যে থাকিবে না, তাহা বলি না; কিন্তু গৃহস্থের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-সাধক প্রবন্ধের অংশ আর একটু বেশী থাকিলে আমরা সুখী হইব। মেঘ ও বৃষ্টির বিচারবিষয়ক একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব ঠিকই লিখিয়াছেন যে, বর্ষবিচার-শাস্ত্র অবলম্বনে আমরা বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি যে, অন্তত উড়িষ্যা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত-বিষয়ক বিচার কৃষকদিগকে বিশেষ সাহায্য করে।

ইণ্ডাষ্ট্রী—২২ নং আর, জি. কর রোড। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

দেখিয়া সুখী হইলাম যে, ইণ্ডাষ্ট্রী পত্রের সম্পাদক মহাশয় কৃতিত্বের সহিত একইভাবে চালাইয়া আসিতে-ছেন, এদেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পত্রিকা বিশেষ আবশ্যক হইলেও উপন্যাসপাঠাদির দ্বারা বিকৃতমস্তিষ্ক যুবকগণের মন আকর্ষণ করিতে পারা বড় সহজ কার্য্য নহে। এই কারণে আমরা অবসর পাইলেই এই পত্রের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিরত হইব না। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, এই পত্রখানি ভারতের গৃহে গৃহে রাখিলে দেশের প্রকৃতই মঙ্গল সাধিত হইবে। সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের একটী অনুরোধ এই যে, তাঁহার ন্যায় ব্যবসায়বুদ্ধি-সম্পন্ন মনীষী ব্যক্তি কেবল পত্র পরিচালনের দ্বারা নহে, কিন্তু পাঁচজনকে লইয়া একটী যৌথ কারবার খুলিয়া এবং পরে তাহাকে বহুবিভাগে বিস্তৃত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করুন। আজকাল কাজের কথা, Scientific India, ব্যবসা ও বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি অনেকগুলি মাসিক পত্র ঋদ্ধিবৃদ্ধিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অন্ততঃ এই সকল পত্রের সম্পাদকগণকে একত্র করিয়া একটি বিস্তৃত যৌথকারবার খোলা নিতান্ত অসম্ভব হইবে না, বরঞ্চ খুবই সম্ভবপর।

কাজের কথা।—বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। গোপালভবন, বেহালায় প্রাপ্তব্য।

আমরা কাজের কথায় ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাই হোক, আমরা ইহার শুভ কামনা করিতেছি। কিন্তু আমাদের দু'একটী বক্তব্য আছে, বর্ত্তমানে দেশে

"Times are out of joint" এসময় আমরা "কাজের কথায়" কেবল কাজের কথাই দেখিতে চাই—উপন্যাসী ধরণের ছেলেদের মন ভুলান কোন কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করি না। যাহাতে দেহ সবল হয়, মন শক্তিসম্পন্ন হয়, এবং আত্মা ভগবানের তেজঃকণা লাভ করিয়া সতেজ হইয়া উঠে, এরূপ প্রবন্ধ ও বিষয়সকল কাজের কথায় স্থান পাইতেছে দেখিলেই আমরা সুখী হইব।

ভারতবর্ষ—১৩৩৮ সাল, ভাদ্র। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার লিখিত "পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপ" প্রবন্ধটী আমাদের বড় ভাল লাগিল। অধ্যাপক মোক্ষমুলার এক-স্থলে বলিয়াছেন যে, যে জাতি নিজের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়, সে জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ভারতের চতুর্দ্দিকে তাহার প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণসমূহ যেরূপ ত্বরিতগতিতে আবিষ্কৃত হইতেছে এবং সেই সকল উপকরণে অক্ষয় অক্ষরে ক্ষোদিত প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবকাহিনী ভারতের শ্রদ্ধাঞ্জলি যেভাবে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাতে আমাদের নিঃসংশয়ে প্রতীতি হয় যে, উন্নতির উন্নততম শিখরে ভারতের পুনরধিরোহণ ভগবানের মঙ্গলবিধানে অদূরবর্ত্তী। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় আজ কিছুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে"কলিকাতার পুরাতন কাহিনী" ধারাবাহিকক্রমে সচিত্র প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল কাহিনী কেবল কৌতূহল নিবৃত্তি করে না, কিন্তু ইহার অন্তর্নিবিষ্ট অনেক বিষয় আজকালকার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে করি।

প্রবর্ত্তক।—ভাদ্র ১৩৩৮ সাল। "উপাসনা মন্দিরে" নামক প্রবন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট বড়ই সত্য বলিয়া লাগিল। ইহা বড়ই সত্য কথা যে, ধর্ম্ম যদি আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে বিজয়দান না করে, তবে মানুষ পরাজয়লাভের জন্য ধর্ম্মকে ধরিতে যাইবে কেন? আমরা খুব দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি ও বলিতে চাই যে, ধর্ম্ম কেবল থিওরি হিসাবে ধরিয়া রাখিবার বস্তু নয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রেও আমাদের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনে Practical সহায়রূপে ধরিয়া রাখিবার বস্তু। এই তথ্যটী আজ কয়েকমাস পূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, প্রবর্ত্তকসম্পাদক মহাশয় উপাসকদিগের অন্তরে এই সত্য ভাবটী মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "বৈদিক যুগে" প্রবন্ধে স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি বেদোক্ত অনেক কথা, পুরাণোক্ত কথার সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া পুরাকাল সম্বন্ধীয় ইতিহাসরচয়িতাগণের গবেষণার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। "আয়ুর্ব্বেদ" প্রবন্ধে ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভিষগাচার্য্য মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক প্রাচীন তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা মিষ্ট হইলেও এই তত্ত্বের স্বল্পমাত্র পরিবেশনে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমাদের অনুরোধ, ভিষগাচার্য্য মহাশয় পাশ্চাত্য ও আয়ুর্ব্বেদীয় উভয়বিধ চিকিৎসার তুলনাত্মক প্রবন্ধ লিখিয়া কোন্ বিষয়ে কোন্ চিকিৎসা শ্রেয়ঃকল্প তাহা যেন প্রদর্শন করেন।

কল্যাণী।—১ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা। ১৩৩৮ সাল। ২০৭নং আপার সারকুলার রোড হইতে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংখ্যা হইতেই ভারতে বস্ত্র-সমস্যা আলোচনা করিয়া বড়ই ভাল করিয়াছেন। বস্ত্রসমস্যার সমাধানই ভারতের কল্যাণের সর্ব্বোত্তম পথ প্রদর্শন করিবে বলা যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন ৺রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত "The Economic History of British India" অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেছিলাম, তখন আমারও অন্তরে এই সত্যই সুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল, যে বস্ত্রসমস্যার সমাধানেই আমাদের প্রকৃত স্বরাজলাভের সম্ভাবনা, এবং এই সমাধানের কেন্দ্রমন্ত্র হইতেছে চরকায় সূতা কাটা, এবং সেই সূতা হইতে বস্ত্র বয়ন করিয়া ব্যবহার করা। আজ ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কটকে প্রথম গমন করি তখন সেখানে সাধারণত দরিদ্র-ধনীনির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে এই প্রকার পরিধেয় প্রচলিত দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। তখন মটরগাড়ী ও লরী প্রভৃতির কোনই উৎপাত ছিল না—কিন্তু এখন সেই উৎপাত সুদূর পল্লীগ্রাম অধিকার করায় পল্লীবাসীরা ঐরূপ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" পরিধান করিতে লজ্জা বোধ করে। চরকার সূতায় প্রস্তুত বস্ত্র বিস্তৃতভাবে প্রচলিত করিতে গেলে আমাদের কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রকৃতই এখন যেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহা আরও অনেক পাতলা না হইলে পরিবার ও কাচিবার বড়ই অসুবিধা হয় বলিয়া অনেকে উহা ক্রয় করেন না। উহার মসৃণতা খুব কম বলিয়া উহাতে অনেক ধূলা জমিয়া যায়। দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কিনিবার পথে খুব বড় বাধা এই যে, ইহা ধোপারবাড়ী দিলে বড়ই শীঘ্র ফাঁসিয়া যায়। আর একটা কথা এই, চরকায় সূতা কাটা হইলেও তাহা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিবার উপযুক্ত স্থান ও সুবিধা সহজে পাওয়া

যায় না। আমরা খদ্দরের পক্ষপাতী। অনেকের কাছে শুনিয়াছি যে, ঐরূপ সুবিধার অভাব উহার বিস্তৃত প্রচলনের পথে আর একটি গুরুতর বাধা। কি অর্থনৈতিক কি রাষ্ট্রনৈতিক ভারতের অনেকবিধ সঙ্কট দূরীকরণে খদ্দরের ক্ষমতা আজ বোধ হয় কোন ভারতবাসী অস্বীকার করিবেন না।

সংবাদ।

শ্রীভগবৎকথা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের "শ্রীভগবৎকথা" আসামী ভাষায় ও তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ইহার বঙ্গভাষায় তিনটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গ্রন্থখানি সাধনপিপাসু জনসাধারণের অনুরাগ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধলেশ-বর্জ্জিত। এজন্য আমরা অনুরোধ করিতে দ্বিধা করি না যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যেন এই গ্রন্থকে বালকগণের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দেশ করেন। কোন ছাত্র বা ছাত্রী আবেদন করিলে, তাঁহাকে এই পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ ।• আনায় দেওয়া হইবে। তেলেগু সংস্করণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত নরসিংহম্ রাও গণ্টূরের "জ্ঞানসাধনী" পত্রিকার সম্পাদক। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, অনুবাদটী নির্ভুল ও সুন্দর হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বঙ্গনারী-শিক্ষাসঙ্ঘের সঙ্গীত-জল্‌সা।—গত ১লা আগষ্ট শনিবার বঙ্গনারী শিক্ষা-সঙ্ঘের (Bengal Womens Education League) তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতভারতী ডাঃ শ্রীবাণী দেবী D. Mus. "রাগ-রাগিণী—প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যসঙ্গীতে" সম্বন্ধে একটী উপভোগ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রায় চারি শত মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। সভায় সঙ্গীত-জল্‌সার বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। একটি অনুপম কনসার্ট বাদিত হইয়াছিল। (উহার স্বরলিপি বর্ত্তমান সংখ্যায় পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইল)। সভাটী সর্ব্বদিক দিয়া সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছিল।

—সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা—ভাদ্র ১৩৩৮ সাল।

কলিকাতা মাদকবর্জ্জন সঙ্ঘ।—গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার ২২নং সেণ্ট জেম্‌স্ লেনস্থ শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা মাদকবর্জ্জন সঙ্ঘের (Calcutta Temperance Fedaration) এক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শান্তি ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত "সুরাপানের নিষেধবিধি" নামক একটি হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পুস্তিকাকারে উহা বিতরিত হয়। সভাস্থলে প্রায় দুই শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভা অন্তে শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মৈত্র মহাশয় আলোক-চিত্রে সুরাপানের পরিণামবিষয়ে একটি পারিবারিক-চিত্র দেখাইয়া সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

নামকরণ।—গত ২৭শে ভাদ্র রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ডাঃ শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নবকুমারীর অন্নপ্রাশন ও নামকরণ তদীয় গড়পার-রোডস্থিত বাসভবনে উপাসনাদি পূর্ব্বক যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবকুমারীর নাম গীতাঞ্জলি রাখা হইয়াছে। ভগবান নবকুমারীকে দেহে মনে ও আত্মাতে অশিষ্ট প্রতিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করুন।

ওঁ তৎসৎ

রাগিণী—তাল

মিশ্র ঝিঁঝিট—ঠুংরি

ডাঃ শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতভারতী-কৃত

স্বরসম্বাদ-সহ

বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সঙ্ঘের

(Bengal Women's Education League)

তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতসভা কার্য্যতালিকা।

PART I.

Piano (Duet)—Sm. Gargi Mookerji and Sm. Bani Chatterji.

Dhrupad—Arhana Chautal—Sangit Nayak Gopeshwar Benerji.

Violin (Duet)—Bech—Mons. Ph. Sandre D. Mus. and Sm. Bani Chatterji.

Sarode—Brindabani Sarang—Kaoali—Sj. Rajendra Narayan Sen-Gupta.

Lecture—Rag-Raginis in Indian and Western Music—Sm. Bani Chatterji D. Mus.

জাগো সবে জাগো—Loom—Patatal—(British Grenadiers সুর)—
Master Amritamaya Mookerji

Go where glory waits thee—(মরি ও কাহার বাছা সুর—Misra Jhinjhit—Kaoali)
Mrs. K. K. Chatterji.

PART II.

Violin (Solo)—Paganini—Dr. Ph. Sandrê.

Thumri (Song)—Khumbaj—Tetala—Sj. Romesh Ch. Banerji,

Sitar (Solo) Piloo-Baroan—Kaoali—Sj. A. B. Adhikari.

Orchestra—Ragini Misra Jhinjhit—Tal Thumri—Sm Bani Chatterji, D. Mus.
Mrs. A. Mookerji, Mrs. J. M. Bir, Mrs. J. M. Sen.
Miss. S. Sen and Misses Sen.
Messrs. J. M. Bir, A. B. Adhikari, S. K. Ghose, F. N. Banerji,
R. N. Sen Gupta, A. C. Banerji, S. N. Sen. K. N. Mitter.

Price One Anna.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। পিয়ানোর (অভাবে ভাল অর্গ্যান হারমোনিয়মের) রেখাবকে ষড়জ করিয়া সেতার, এস্রাজ, তানপুরা, বাঁয়া তবলা ও বেহালার সুর বাঁধিতে হইবে।

২। পিয়ানোর ধৈবতকে ষড়জ করিয়া স্বরদের সুর বাঁধিতে হইবে।

৩। এই গৎটি বাজাইবার জন্য নিয়মত বাদ্যযন্ত্রগুলির আবশ্যক—

এসরাজের ২টি পাঠ বাজাইবার জন্য ২টি এস্রাজ
" ঐ ২টি " " ২টি বেহালা
" ১ম " উচ্চ সপ্তকে বাজাইবার জন্য ১টি বেহালা
সেতারের ৩টি " " " ৩টি সেতার
স্বরদের ১টি " " " ১টি স্বরদ
পিয়ানো ১টি (অভাবে ১টি ভাল অর্গ্যান-হারমোনিয়ম)

সঙ্গতের জন্য তানপুরা, বাঁয়া তবলা এবং মন্দিরা (বা ঐজাতীয় বাদ্যযন্ত্র) আবশ্যক।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই গৎটি ভালরূপে বাজাইবার জন্য মোট ১৩টি বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন।

অভাবপক্ষে ২টি এস্রাজ (এস্রাজের ১ম ও ২য় পাঠ বাজাইবার জন্য)
২টি সেতার (সেতারের " ও " " " ")
১টি তানপুরা, বাঁয়া তবলা ও মন্দিরা হইলেই চলিবে।

৪। সেতারের পাঠে প্রত্যেক হাইফেন-যুক্ত আকার (যথা "-া") চিহ্নের জন্য একটি ঝঙ্কার দিতে হইবে। অতএব যেখানে ঐরূপ ১টি হাইফেন-যুক্ত আকার আছে (যথা "-া) সেখানে ১টি ঝঙ্কার দিতে হইবে। যেখানে ঐরূপ ২টি হাইফেন-যুক্ত আকার আছে (যথা "-া -া") সেখানে ২টি ঝঙ্কার দিতে হইবে। ইত্যাদি

৫। যেখানে হাইফেন-বর্জ্জিত আকার (যথা "া") চিহ্ন যতগুলি থাকিবে, সেই কয় মাত্রা বিশ্রাম দিতে হইবে।

৬। অতি সতর্কতার সহিত মাত্রা ও তালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা জানা কথা যে অনেকের একসঙ্গে কোন গৎ বাজাইতে হইলে তাল ও মাত্রার অতি সামান্যমাত্রও এদিক ওদিক হইলে শ্রুতিকটু হয়।

৭। এই গৎটিতে ৬০টি "ঘর" বা bar আছে এবং প্রতি ৪র্থ ঘরের শীর্ষদেশে যথাযুক্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রারম্ভের প্রথম ২টি ঘরে (১ ও ২নং ঘর) কেবল পিয়ানো, তানপুরা, মন্দিরা ও বাঁয়া-তবলা বাজিবে। পিয়ানোর অভাবে শেষ কয়টি যন্ত্র বাজিবে। অন্যান্য যন্ত্রগুলি ঐ ২টি "ঘর" বা তালনির্দ্দেশক সময় বিশ্রাম লইবে—বাজিবে না।

৮। সমগ্র গৎটি অন্যূন ২ বার বাজাইতে হইবে। শেষ করিয়া পুনরায় ধরিবার সময় "II" চিহ্নিত স্থলে আরম্ভ করিতে হইবে।

৯। এইরূপ গতের বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে সকল যন্ত্রই একই সংখ্যাযুক্ত "ঘর" বা bar বাজাইবে। যথা, যদি একটি যন্ত্র "৪" সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট ঘর বাজায়, তাহা হইলে অন্যান্য যন্ত্রগুলিও সেই একই সময়ে এবং একই সঙ্গে "৪" সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট ঘর বাজাইবে। অবশ্য কোন কোন যন্ত্রের জন্য হয় ত সেই ঘরটি বিশ্রাম আছে, তাহা হইলে না বাজাইলেও মাত্রা গণিয়া যাইতে হইবে।

———

এস্রাজ বা বেহালা ১ম পাঠ।

ইহা বেহালায় উচ্চ সপ্তকেও বাজাইতে হইবে।

```
                                 ৪
 ১´         •           ১´       •             ১´          •
I † † † † | -† -† † † I  সা রা সা ণা |  ধা -† -† -† I  পা ধা ণা ধা | র্সা -† -† না I

                                                        ১২
 ১´         •          ১´       •            ১´          •
I ণ্‌া -† -† -† |  সা রা সা ণা I  ধা † -† -† | পা ধা ণা ধা I  মা -† -† -† |  মা † † † I

                             ১৬
 ১´         •          ১´    •           ১´          •
I মা মা -† ধা | পা -† -† ধণা I ধা -† -† -† | ধা -† ধা মা I পা -† -† -† | মা গা রা গা I

         ২০                                           ২৪
 ১´       •         ১´         •          ১´          •
I মা -† -† -† | মা মা -† ধা I পা -† -† ধণা | ধা -† -† -† I ধা -† ধা মা | পা -† -† -† I

                             ২৮
 ১´         •          ১´    •           ১´          •
I মা গা রা গা | মা † † † I  মা † সা † |  সা র্সা র্সা -† I  র্সা -† -† -† |  ণা -† ধা -† I

          ৩২                                          ৩৬
 ১´        •          ১´       •           ১´          •
I ধা র্সা -† -† | র্ণা -† -† ধা I পা -† -† -† | পা ধা ণা র্সা I  ধা পা মা গা | মা র্সা র্সা -† I

                              ৪০
 ১´         •          ১´     •           ১´          •
I র্সা -† -† -† | ণা -† ধা -† I  ধা র্সা -† -† | র্ণা -† -† ধা | পা -† -† -† | পা ধা না র্সা I

          ৪৪                                          ৪৮
 ১´        •          ১´       •           ১´          •
I ধা -† -† -† | মা মা -† ধা I পা -† -† ধণা | ধা -† -† -† I  ধা -† ধা মা | পা -† -† -† I

                              ৫২
 ১´         •          ১´     •           ১´          •
I মা গা রা গা | মা -† -† -† I মা -† -† -† | মা মা -† ধা I  পা -† -† ধণা | ধা -† -† -† I

          ৫৬                                          ৬০
 ১´        •          ১´       •           ১´          •
I ধা -† ধা মা | পা -† -† -† I  মা গা রা গা | মা -† -† -† I মা † † † | † † † † II II II
```

এস্রাজ বা বেহালা ২য় পাঠ।

I । । । । । । । । । II সা রা সা গা। মা -া -া -া I গা মা পা মা। ধা -া -া দা I

I পা -া -া -া। সা রা সা গা I মা -া -া া। গা মা পা মা I রা সা মা । । । । । । I

I মা মা -া ধা। পা -া -া ধণা I ধা -া -া -া। ধা -া ধা মা I পা -া -া -া -া। মা গা রা গা I

I মা । । । । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা। ধা -া -া-া। ধা -া ধা মা। পা -া -া -া I

I মা গা রা গা। মা । । । I মা । সা সা। সা র্সা র্সা -া I র্সা -া -া -া। গা -া ধা -া I

I ধা র্সা -া -া। র্ণা -া -া ধা I পা -া -া -া। পা ধা ণা র্সা I ধা পা মা গা। মা র্সা র্সা -া I

I র্সা -া -া -া। ণা -া ধা -া I ধা র্সা -া -া। র্ণা -া -া ধা I পা -া -া -া। পা ধা ণা র্সা I

I ধা -া -া -া। মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা। ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা। পা -া -া -া I

I মা গা রা গা। মা । । । । I মা । । । মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা। ধা -া -া -া I

I ধা -া ধা মা। পা -া -া -া I মা গা রা গা। মা -া -া -া I মা -া -া -া। । । । । II II

সেতার ১ম পাঠ।

শ্রীবাণী দেবী

I ꜛꜛꜛꜛ | ꜛꜛꜛꜛ I ꜛꜛꜛꜛ | ꜛꜛꜛꜛ I ꜛꜛꜛꜛ | ꜛꜛꜛꜛ I ꜛꜛꜛꜛ | ꜛꜛꜛꜛ I ꜛꜛꜛꜛ | ꜛꜛꜛꜛ I

১২

II র্সা র্সা ণা ধা | র্সা ণা ধা পা I মা মা -া ধা | পা -া -া ধণা I ধা -া -া -া |
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা ডা রা রা ডিরি ডা রা রা রা

১৬ ২০

| ধা -া ধা মা I পা -া -া -া | মা গা রা গা I মা -া -া -া | মা মা -া ধা I
ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

২৪

I পা -া -া ধণা | ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা | পা -া -া -া I মা গা রা গা |

২৮

| মা ꜛ ꜛ ꜛ I মা ꜛ সা সা | সা ধা ধা -া I ধা -া ধা -া | পা -া মা -া I
ডা ডা

৩২

I মা ধা ধা -া | পা -া পা মা I গা -া গা -া | পা ধা ণা র্সা I ধা ধপা মা গা |

৩৬ ৪০

| মা ধা ধা ধা I ধা ধা ধা ধা | পা পা মা মা I মা ধা ধা ধা | পা পা পা মা I

৪৪

I গা গা গা গা | পা ধা ণা র্সা I ধা ধা ধা ধা | মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা |

৪৮

| ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা | পা -া -া -া I মা গা রা গা | মা -া -া -া I

৫২

I মা -া -া -া | মা মা -া ধা I পা -া -া ধণা | ধা -া -া -া I ধা -া ধা মা |

৫৬

| পা -া -া -া I মা গা রা গা | মা -া -া -া I মা ꜛ ꜛ ꜛ | ꜛ ꜛ ꜛ | IIII
ডা রা রা রা ডা

সেতার ২য় পাঠ।

৪ ৮
১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I া া া া। া া া া I া া া া। া া া া I া া া া। া া া া I া া া া। া া া া I

১২
১´ • ১´ • ১´
I া া া া া। া া া া II গা ধা পা মা। ধা পা মা গা I সা সা -া মা।
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা

১৬
• ১´ • ১´ •
। গা -া -া মপা I মা -া -া -া। মা -া মা রা I গা -া -া -া। রা সা ণ্া ণ্া I
ডা রা রা ডিরি ডা রা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা রা

২০
১´ • ১´ • ১´
I ধ্া -া -া -া। সা সা -া মা I গা -া -া মপা। মা -া -া -া I মা -া মা রা।

২৪ ২৮
• ১´ • ১´ •
। গা -া -া -া I রা সা ণ্া ণ্া। ধ্া া া া I ধ্া া সা সা। সা রা গা -া I
ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা

৩২
১´ • ১´ • ১´
I গা -া গা -া। রা গা সা -া I সা মা মা -া। সা রা গা রা I সা -া সা -া।

৩৬
• ১´ • ১´ •
। গা মা পা ধা I মা মগা রা সা। রা সা গা -া I গা গা গা গা। রা গা সা -া I

৪০
১´ • ১´ • ১´
I সা মা মা মা। সা রা গা রা I সা সা সা সা। গা মা পা ধা I মা মা মা মা।

৪৪ ৪৮
• ১´ • ১´ •
। সা সা -া মা I গা -া -া গগা। মা -া -া -া I গা -া মা রা। গা -া -া -া I

৫২
১´ • ১´ • ১´
I রা সা ণ্া ণ্া। ধ্া -া -া -া I ধ্া -া -া -া। সা সা -া মা I গা -া -া গগা।

৫৬
• ১´ • ১´ •
। মা -া -া -া I গা -া মা রা। গা -া -া -া I রা সা ণ্া ণ্া। ধ্া -া -া -া I
ডা রা রা রা

৬০
১´ •
I ধ্া া া া। া া া া IIII
ডা

“-া” চিহ্নিত স্থলে একটি ঝঙ্কার হইবে।

“া” ” বিশ্রাম বুঝাইবে।

ইহাতে ৬০টী ঘর বা (bar) আছে। প্রথম ২টি ঘরে কেবল পিয়ানো ও তানপুরা বাজিবে; পিয়ানোর অভাবে কেবল তানপুরা বাজিলেও চলিবে।
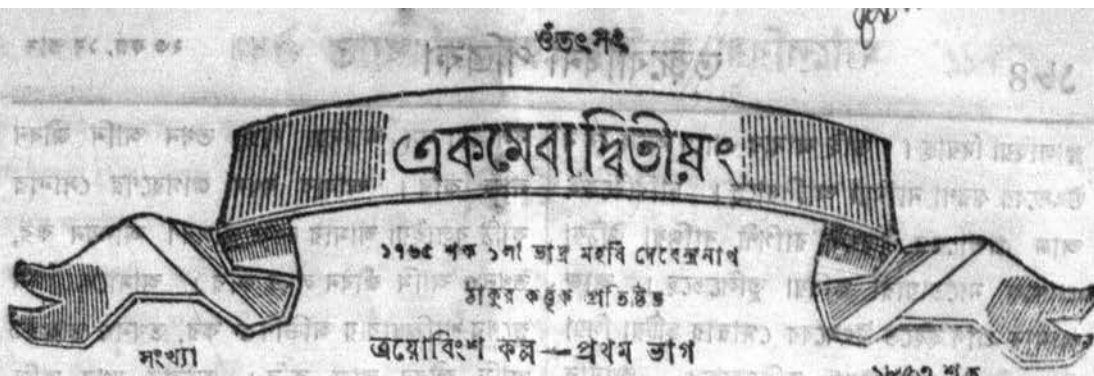
সেতার ৩য় পাঠ

I । । । । । । । । । II স্া র্া স্া ণ্া । ধ্া -া -া -া I প্া ধ্া ণ্া ধ্া । সা -া -া ন্া I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

I ণ্া -া -া -া । স্া র্া স্া ণ্া I ধ্া -া -া -া । প্া ধ্া ণ্া ধ্া I ম্া -া -া -া ।

। ম্া গ্া ম্া গ্া I ম্া ম্া -া ধ্া । প্া -া -া ধণ্া I ধ্া -া -া -া । ধ্া -া ধা ম্া I
রা ডা রা ডা ডা রা রা ডিরি ডা রা রা রা

I প্া -া -া -া । ম্া গ্া র্া গ্া I ম্া -া -া -া । ম্া ম্া -া ধ্া I প্া -া -া ধণ্া ।

। ধ্া -া -া -া I ধ্া -া ধ্া ম্া । প্া -া -া -া I ম্া গ্া র্া গ্া । ম্া -া -া -া I

I ম্া -া স্া স্া । স্া সা সা -া I সা -া সা -া । ণ্া -া ধ্া -া I ধ্া সা -া -া ।

। সণ্া -া -া ধ্া I প্া -া -া -া । প্া ধ্া ণ্া সা I ধ্া প্া ম্া গ্া । ম্া সা সা -া I

I সা সা সা সা । ণ্া ণ্া ধ্া ধ্া I ধ্া সা সা সা । সণ্া ণ্া ণ্া ধ্া I প্া প্া প্া প্া ।

। প্া ধ্া ণ্া সা I ধ্া ধ্া ধ্া ধ্া । ম্া ম্া -া ধ্া I প্া -া -া ধণ্া । ধ্া -া -া -া I

I ধ্া -া ধ্া ম্া । প্া -া -া -া I ম্া গ্া র্া গ্া । ম্া -া -া -া I ম্া -া -া -া ।

। ম্া ম্া -া ধ্া I প্া -া -া ধণ্া । ধ্া -া -া -া I ধ্া -া ধা ম্া । প্া -া -া -া I

I ম্া গ্া র্া গ্া । ম্া -া -া -া I ম্া । । । । । । । । II II
ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা

ওঁতৎসৎ

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯১। গান গাও, আর আমি শুনি।

মা! তুমি গান গাও, আর আমি সেই গান শুনি আর গাইতে শিখি। যে গানে আমার পাষাণ হৃদয় গলিয়া গিয়া অশ্রুতে পরিণত হইবে এবং তোমার চরণ ধৌত করিবে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে প্রেমের বন্যা বহিয়া আমার শুষ্ক হৃদয়মরুভূমের দুই কূল ভাসাইয়া দিবে এবং আমার এই মরা মনকে তোমার চরণের শান্তিময় উপকূলে উপস্থিত করিবে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমাকে নিশীথের ঘোর অন্ধকারে ঘিরিয়া রাখে এবং বাহিরের শত টানাটানি হইতে রক্ষা করে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমার অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, এবং আমাকে সংসারের ভার হাসিমুখে বহন করিবার সক্ষমতা প্রদান করে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমার প্রাণে চাঁদের কিরণ খেলা করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে এবং আমার মুখের জ্যোতি অপূর্ব্ব সুষমা লাভ করিতে পারে, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমি আমার জীবনতরী নির্ভয়ে অকূল অপার সাগরে ভাসাইয়া দিতে পারি এবং যথাসময়ে তোমার চরণের কূলে গিয়া পৌঁছিতে পারি, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। যে গানে আমার এই বক্ষে-লাগা শত-সহস্র ঝড়-ঝটিকার প্রবল বেগ সহ্য করিবার দৃঢ়তা ধারণ করিতে পারি এবং তাহার মধ্যে তোমার প্রসন্ন মুখের সুমঙ্গল জ্যোতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, তুমি আমাকে সেই গান শোনাও। জননী! আমাকে কোলে লইয়া তোমার গীতগাথা আমাকে শোনাও—আমি সকলের অন্তরালে তোমারই কোলে আশ্রয় লই আর সেই গান শুনি। দিবা-নিশি তোমার প্রেম আর আমার অশ্রু মিশিয়া গিয়া আমাকে বিগলিত করিয়া দিক। আমি আর আমাতে থাকিতে চাহি না, আর পারিও না। আমি তোমার ঐ চরণের ধূলি হইয়া যাহাতে সারা জীবন তোমার গানে অমৃতধারা শুনিতে পাই, তাহারই ব্যবস্থা তুমি করিও।

৯২। উৎসবের আনন্দে।

মা! আমার প্রাণে যতগুলি প্রদীপ তুমি সাজাইয়া রাখিয়াছিলে, আজ সকল প্রদীপই তুমি

জ্বালাইয়া দিয়াছ। তাই আমার প্রাণে আজ যেন উৎসবের ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকেই আজ প্রভাতের ভৈরবী রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া প্রাণকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেছে। আজ আমার প্রাণ হইতে উৎসবের জোয়ার ছুটিয়া গিয়া বিশ্ববাসীকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমার উৎসবের প্রাঙ্গণে আজ সকলেই ছুটিয়া আসিতেছে। তোমার যে মধুর নাম আমার প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে, আজ বিশ্ববাসী সেই নাম গাহিয়া আত্মহারা হইতে চাহিতেছে। সকলের প্রাণ আমার প্রাণে, আর আমার প্রাণ সকলের প্রাণে আজ তোমার নামের ভিতর দিয়া মিশিয়া যাইতেছে। ভেদ ও দ্বন্দ্ব কিছুই আর আমার দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। আমার প্রাণের ভিতর তোমার জন্য যে স্বর্ণরচিত আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহার উপর তোমার চরণধূলি পড়িয়াছে, তাই আমার অন্তরে বাহিরে এত উৎসবের তরঙ্গ আসিয়া আমার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। এই উৎসব যে এত সহজে সার্থকতা লাভ করিবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কি জানি কি মন্ত্রবলে এই উৎসবের বার্ত্তা আজ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুমি তো আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্রতর প্রাঙ্গণে লোকের পর লোক ডাকিয়া আনিতেছ। কিন্তু আমায় এমন শক্তিসামর্থ্য দাও, যেন আগন্তুক ভক্তদিগের সেবায় কোনপ্রকার ত্রুটী না হয়। আমার একমাত্র সম্বল তোমার মধুর নাম। আমি তাহাই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পরিবেশন করিয়া চলিব। জননী! তুমি দেখো, সেই নামেই যেন সকলের প্রাণে আমি তৃপ্তি আনিয়া দিতে পারি। আমার রসনায় তুমি অধিষ্ঠিত হইও, আর আমার সকল উক্তির ভিতর দিয়া তোমারই শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তি, তোমারই সৌম্য উদার ভাব ফুটিয়া বাহির হউক। আমার জীবনের উন্মেষেও যেমন তোমারই নাম আমার প্রাণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল; জীবনের কাজ যবে শেষ হইবে তখনও যেন তোমারই নাম করিতে করিতে তোমারই চরণতলে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।

১৩। সুখে দুঃখে জীবনলাভ।

মা! আমার চক্ষে যখন তুমি ঘুমের হাত বুলাইয়া ঘুম আনিয়া দাও, তখন আমি জীবন লাভ করি। আবার যখন জাগরণের সোনার কাঠি বুলাইয়া আমার চক্ষে জাগরণ আনয়ন কর, তখনও আমি জীবন লাভ করি। আমাকে যখন সুখের শান্তিধারায় অভিষিক্ত কর, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। আবার যখন তুমি আমাকে দুঃখদৈন্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তোল, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। তুমি যখন আমাকে সুন্দর সজ্জায় সুসজ্জিত কর, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। আবার আমি যখন সংসারে ধূলিধূসরিত দেহে দুর্গন্ধ বহন করিয়া বিচরণ করিতে থাকি, তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। জীবনের লীলাখেলার মধ্যে যখন ডুবিয়া থাকি তখন তাহাতে জীবনলাভ করি। আবার মরণ যখন তোমার শান্তিবার্ত্তা বহন করিয়া আমার শিয়রে নীরবে আসিয়া দাঁড়ায় তখনও তাহাতে আমি জীবন লাভ করি। আমার ঘরের চারিদিকে যখন প্রদীপগুলি জ্বলিয়া তোমার জ্যোতিতে আমার হৃদয়মন আলোকিত করে, তাহাতেও জীবন পাই। আবার যখন সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গিয়া আমাকে ঘন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখে, তাহার ভিতর হইতেও জীবনের উৎস খুলিয়া যায়। সংসারসাগর যখন নিস্তরঙ্গ হইয়া আমাকে শান্তিসাগরে ডুবাইয়া দেয়, তখনও তাহাতে জীবন পাই। আবার যখন সংসারসাগরে প্রবল বেগে ঝঞ্ঝাবাত উঠিয়া আমাকে ভীষণ দোল খাওয়ায়, তখনও তাহাতে জীবন পাই—কখনও বা ঢেউয়ের নীচে তলাইয়া যাই, আর কখনও বা উপরে ভাসিয়া উঠি। তোমার সহিত মিলনে যে অশ্রু বহে, তাহাতেও জীবন পাই। তোমার বিরহে যে অশ্রু ঝরে, তাহাতেও জীবন পাই। তোমার ভ্রূকুটিতেও জীবন পাই। তোমার প্রসন্ন মুখেও জীবন পাই। তোমার নিকট প্রার্থনা করি আমাকে তোমার প্রসন্নমুখ দেখাও।

১৪। অন্তরে আছ, তবু কেন কাঁদি?

মা! কাল ছিলাম ভাল; আজ দেহ বড়ই অসুস্থ হইল। কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়াই তো আকুল। মনের অসুখ কিছুই নাই। মনপ্রাণ তোমারই চরণে চক্ষু রাখিয়া পড়িয়া

আছে। তুমি একবার স্নেহভরে নাম ধরিয়া ডাক, আমার সকল রোগ সকল কষ্ট দূর হইয়া যাক। তুমি যখন আমার মাথার শিয়রে দিনরাত আছ, তবু আমার প্রাণে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠে কেন? রোগশোক দুঃখকষ্ট আমার মাথার উপর জমাটবাঁধা ঘন মেঘের মত দাঁড়াইয়া আছে। আমার প্রাণের চারিদিক যেন গুমট হইয়া আছে—হাসিগান সকলই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কুলকুল-ধ্বনিতে নদী আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার প্রাণ আজ যেন তাহাতে সাড়া দিতে পারিতেছে না। বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতেছে, তাহার এক-একটী বিন্দুর তালে তালে গাছের এক-একটী পাতা গ্রীবাভঙ্গী সহকারে কতই নৃত্য করিতেছে, কিন্তু আমার প্রাণে যেন আজ তাহা সাড়া দিতে চায় না। মা! একটীবার তুমি ডাক, আমার রোগশোক, দুঃখকষ্ট দূর হইয়া যাক; আমার প্রাণের হাসির উৎস আবার শত-ধারে উৎসারিত হইয়া উঠুক। সেই ছেলেবেলার মত জীবনের এই সন্ধ্যাকালেও যেন তোমায় মা—মা বলিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি। দিনের বেলাতেও যেমন তোমারই নয়নে নয়ন রাখিয়া জাগিয়া থাকি, রাত্রিতেও যেন সেইরূপ তোমারই অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তোমারই কোলে সুখে নিদ্রা যাই।

(১৫) চিরসাথী।

মা! আজ শরতের প্রকৃতি আনন্দে ঢলঢল। তাহার আকাশে বাতাসে হাসি যেন ধরে না। কিন্তু আমাকে তুমি একি অবস্থায় ফেলেছ যে, আমার প্রাণে দিনরাত ঘন বিষাদেরই ক্রন্দন জাগিয়া থাকে। আমার প্রাণের গান থামিয়া গিয়াছে, সমস্ত চিন্তার উৎস যেন শুকাইয়া গিয়াছে—কেবল জাগিয়া আছে কান্না—কান্না। জানি না আমার এ চোখের জল তুমি কবে মুছাইয়া দিবে। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত আসে, আমার প্রাণের উপর তাহাদের কোনও স্পর্শই যেন আসিয়া লাগে না। গ্রহ-তারাগুলি আঁধার রাত্রি ভেদ করিয়া কি সুন্দর হাসিই না হাসে। আমার মুখে যেন তাহার কিছুমাত্র স্পর্শ লাগিতেই চায় না। সূর্য্য উঠিয়া সান্ধ্যস্নানের জন্য পশ্চিম সাগরে কি আনন্দখেলা খেলিতে খেলিতে অবগাহন করে। পূর্ণিমার চাঁদ পূর্ণ যৌবনের কি আনন্দে সাগরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে আর হাসিতে কুটিকুটি হইয়া যায়। আমার কিন্তু একমাত্র তোমা ব্যতীত প্রাণের সঙ্গে খেলার চিরসাথী আর কেহই নাই। আজ মনে হয় যেন কত দীর্ঘ দীর্ঘ কাল তোমার চরণপূজার অবসর পাই নাই, তাই আমার প্রাণটা দুঃখকষ্টের কঠিন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। বিপদের মেঘজাল আমাকে ঘিরিয়া ফেলিতে চায়। মা! তোমার প্রসন্ন মুখ আমাকে দেখাও। আমার বুকের উপর তোমার চরণখানি রাখো। ঐ সমস্ত দুঃখকষ্ট ও বিপদবিষাদের ভিতর দিয়া তোমারই আগমনী গীত ভৈরবী রাগিণীতে বাজিয়া উঠুক। তখন মেঘমুক্ত আকাশের মত আমার প্রাণ নির্ম্মল হইবে আর তোমার প্রসন্ন মুখের হাসিতে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে তোমার চরণের দাস বলিয়া গ্রহণ কর। তাহাতেই আমার জীবনের সমস্ত আশাভরসা পরিসমাপ্ত হউক।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?

(৺বিপিনবিহারী ঘোষাল)

(২)

ভগবান শিব বলিয়াছেন :—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো, ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৪শ উল্লাস, ১২২ শ্লোক।

একমাত্র পরব্রহ্মকে সর্ব্বত্র সত্যবস্তুরূপে যে দর্শন বা উপলব্ধিকরণ, তাহাই সাধকের উত্তম ভাব (অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপ ভজনা)। ধ্যানতার মধ্যমরূপ ভজনা। স্তোত্রপাঠ বা জপ, ইহা অধমরূপ ভজনা। আর বাহ্য পূজা অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতিপ্রদান * বা প্রতিমাদিতে যে দেবতার অর্চ্চনা, তাহা অধম হইতেও অধম ভাব অর্থাৎ তাহা যার-পর-নাই অপকৃষ্টরূপ ভজনা।

* কোন কোন স্থলে এইরূপ পাঠভেদ দেখা যায়, যথা—
উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো হোমপূজাঽধমাধমা॥

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত তাঁহাদিগের প্রতি যে শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে মূর্খ, ভ্রান্ত, অল্পবুদ্ধি, অল্প-তপস্যাসম্পন্ন, তামস-জ্ঞানপ্রাপ্ত, অধিক কি আত্মহননকারী, গরুর গাধা ইত্যাদি কুৎসিত বাক্যসকল প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা দ্বারাই বা তাঁহাদের অন্তরের কি ভাব প্রকাশ পায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি মাত্র। যথা,—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

কিং স্বল্পতপসাং নৃণাম্ অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৮৪ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ঋষিগণ! যে সকল মনুষ্য প্রতিমাতে দেবতাদর্শন করে, তাহাদিগের কি অল্প তপস্যা?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন;—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধী
যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৮৪ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ঋষিগণ! যে ব্যক্তির এই ত্রিধাতুবিশিষ্ট অর্থাৎ কফ-পিত্ত-বায়ুময় দেহে আত্মবোধ হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আপনার জ্ঞান হয় এবং মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয়, আর যাহার গঙ্গা-যমুনাদি জলেতে তীর্থবোধ হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিতে সেরূপ হয় না, সে ব্যক্তি অতি বড় গরু, বা গরুর জন্য তৃণাদি ভারবাহী গর্দ্দভবিশেষ।

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং বিষ্ণুর্যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥

ব্রহ্মপুরাণ।

উত্তর-গীতায় এই শ্লোকের এইরূপ পাঠ আছে, যথা,—

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

উত্তরগীতা, ৩য় অধ্যায় ৮ শ্লোক।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে:—

যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড-রত সাধারণ দ্বিজাতিগণ অগ্নিকে দেবতারূপে দর্শন করেন, যোগীগণ হরিকে হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, অল্পবুদ্ধি লোকসকল প্রতিমাতে দেতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আর পরমাত্ম-জ্ঞানপ্রাপ্ত সমদর্শী ব্যক্তিরা প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক ভূতে পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করেন।

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ কেহ বা সুখং॥

পঞ্চদশী। চিত্রদীপ ২১৭।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা সকলেই ভ্রান্তরূপে পরিগণিত হন। সে অবস্থায় তাঁহাদিগের মুক্তিই বা কোথায় আর সুখই বা কোথায়?

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

রঘুনন্দনস্মৃতি। আহ্নিক-তত্ত্ব।

সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যগণের জলেতে দেবতাবুদ্ধি হয়, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের আকাশেতে দেবতা-বুদ্ধি হয়, মূর্খ লোকদিগের কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে দেবতাবুদ্ধি হয়, আর যোগশীল ব্যক্তিগণের আত্মাতে দেবতাবুদ্ধি হইয়া থাকে।

ভগবান শিব বলিয়াছেন:—

মৃচ্ছিলা-ধাতু-দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ১৪শ উল্লাস, ১২৯ শ্লোক।

মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমাসমূহে ঈশ্বরবুদ্ধি করত মূঢ় তপস্বীসকল কেবল কষ্টভোগ করে, কিন্তু মুক্তিরূপ যে উৎকৃষ্ট শান্তি তাহা অবগত হইতে পারে না।

ভগবান শিব নামরূপাদি কল্পনাসমূহকে বালক্রীড়ার ন্যায় জানিয়া ঐ সকলকে পরিত্যাগ করত মনুষ্যগণকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে বারংবার উপদেশ করিয়াছেন; যথা,—

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপ-নামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪ উল্লাস, ১১৭ শ্লোক।

যে ব্যক্তি রূপ নাম আদি কল্পনাসমূহকে বালক্রীড়ার ন্যায় জানিয়া ঐ সকলকে পরিত্যাগ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সে-ই মুক্তিলাভ করে।*

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

---

* তুলসীদাস নামক প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি বলিয়াছেন:—

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে সব্ গোড়িয়াকি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবরু হোয়ি তো রাখ্ পেটারি মেল্॥

দোঁহাবলী।

হে তুলসীদাস! এই যে জপ-তপ-প্রতিমা পূজা, এসমস্তকে বালিকাদিগের পুত্তলিকা খেলার ন্যায় জানিবে। যতদিন বালিকাদিগের স্বামীসহবাস না ঘটে তাহারা সেই পর্য্যন্ত যেমন ঐ সকল পুত্তলিকা লইয়া খেলা করে, পরে স্বামীসহবাস হইলে সেই সকলকে পেটিকায় তুলিয়া রাখে, এই সকল জপ-তপ-প্রতিমা-পূজাকেও সেইরূপ বুঝিবে।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

যিনি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অবস্থিত পরস্পর বিভক্ত পদার্থসকলের মধ্যেও অবিভক্তরূপে অবস্থিত এক পরমাত্মার অব্যয় ভাব নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার সেই জ্ঞানকে তুমি সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিও।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

আর প্রতিমা বা কোন দেহ প্রভৃতি একএকটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট পদার্থে পরমেশ্বর সম্পূর্ণরূপে আছেন এইরূপ যে বাস্তবিক অযৌক্তিক ও তুচ্ছ জ্ঞান, হে অর্জ্জুন! তাহাই তামস জ্ঞান শব্দে কথিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উত্তম, মধ্যম, এবং প্রাকৃত ভাগবতের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান শিব আরও বলিয়াছেন যে, অন্যান্য যুগ যেরূপ অন্যান্য শাস্ত্র প্রধান, যথা—সত্যযুগ বেদপ্রধান, ত্রেতাযুগ স্মৃতিপ্রধান, দ্বাপরযুগ পুরাণপ্রধান, সেইরূপ কলিযুগ তন্ত্রপ্রধান; এবং সেই তন্ত্রমধ্যে কলিযুগের মনুষ্যগণের জন্য কলিজনিত যাবতীয় অশুভনিবারণের এবং অতি সহজে মুক্তিলাভের উপায়স্বরূপ তিনি এইরূপ বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে।
নিস্তার-বীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি! কৈবল্যায় সুখায় চ॥
মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৩য় উল্লাস।

হে প্রিয়ে! অতি দুস্তর, তপস্যাদিবিহীন, ঘোর পাপযুগ কলিতে ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের বীজস্বরূপ।

হে দেবি! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, কলিতে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে কৈবল্য সুখ অর্থাৎ মুক্তিলাভের অন্য উপায় আর নাই, নাই।

ভগবান শিব তন্ত্রমধ্যে যে কুলাচার ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি উত্তম কুলাচারীর লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১০ম উল্লাস, ২১২।

হে পার্ব্বতি! যিনি ব্রহ্মেতে সকল বস্তুর অবস্থিতি এবং সমস্ত জগতে ব্রহ্মের অবস্থিতি দর্শন করেন, তাঁহাকেই তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুলাচারী এবং জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া জানিও।

গীতার মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই ভাব সর্ব্বত্র বর্ণন করিয়াছেন। যথা, তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩শ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বিনাশী বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনাশীরূপে বর্ত্তমান এই পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত দেখে, সে-ই যথার্থ দেখে।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৩শ অধ্যায়, ২৮ শ্লোক।

হে ধনঞ্জয়! সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত যে পরমেশ্বর তাঁহাকে যিনি সকল স্থানে সমানরূপে দেখেন, তিনি আর আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে হনন করেন না; এইজন্য তিনি পরম গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

যাঁহারা পরমাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন না করেন, গীতার মতে এবং শ্রুতির মতে তাঁহারা পরমাত্মাকে হনন করেন।

ঈশোপনিষদে এইরূপ শ্রুতি আছে:—

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

যাহারা আত্মহননকারী অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞানবিহীন, তাহারা মৃত্যুর পর অজ্ঞানাচ্ছন্ন যে অসুরযোনি তাহাতে যাইয়া জন্মগ্রহণ করে।

কেনোপনিষদেও এইরূপ বচন আছে; যথা—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

যদি ইহলোকে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মকে জানিতে পার, তবে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। আর ইহলোকে থাকিয়া যদি তাঁহাকে না জানিতে পার, তবে মহতী হানি হইবেক। ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে প্রত্যেক পদার্থে অবস্থিত জানিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন এবং অমরত্ব লাভ করেন।

যাহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান শিব এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপান্ত-প্রাপ্তো মন্ত্র-মহামণিঃ॥

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ॥
গায়ন্তি গাথিনীং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ।
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ॥
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ।
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ॥
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্ম সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৩য় উল্লাস ১৮—২২।

এই ব্রহ্মমন্ত্র রূপ মহামণি যাঁহার কর্ণোপান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, তিনিই সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত। হে পার্ব্বতী! তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ, তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত। ১৮—১৯। শিবে! তাঁহার মাতা পিতা ধন্য হন, তাঁহার কুল পবিত্র হয়, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহারা পুলকিতশরীর হইয়া এই গাথা গান করেন যে, (২০) আমাদের বংশে উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছে। আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদানে আর আবশ্যক কি? তীর্থেই বা আবশ্যক কি? শ্রাদ্ধতর্পণেই বা আবশ্যক কি? ২১। আমাদের উদ্দেশে দানেই বা প্রয়োজন কি? জপেই বা প্রয়োজন কি? অন্যান্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি? আমাদের এই সৎপুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা রূপ যে সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ২২। ইত্যাদি—

যাঁহারা নিরাকার সত্য বস্তুর উপাসনায় অসমর্থ হইয়া প্রথমতঃ সাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যাহাতে সেই স্থূলভাব হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মভাবে উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য শাস্ত্রকারগণ সকলেই বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন; যথা,—

স্থূলে নির্জ্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ।

বিষ্ণুপুরাণের ২।১।৩৫ শ্লোকের টীকায় স্বামীধৃত বচন।

স্থূল চিন্তারত আত্মাকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তুতে লইয়া যাইবে।

বিষ্ণুপুরাণের ৬ষ্ঠ অংশের ৭ম অধ্যায়ে ৮৫ হইতে ৯০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই কয়েকটী বচনে এই বিষয়টী অতি পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

ভগবান শিবও মহানির্ব্বাণ এবং কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে এই ভাব অনেক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে যে এক্ষণে আর আমাদের দেশে কার্য্য হয় না, তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহারা আমাদের সমাজের উপদেষ্টা তাঁহারা প্রায়ই আপনাদের দায়িত্ব অনুভব করিয়া কার্য্য করেন না; তদ্ব্যতীত অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপদেষ্টা যিনি তিনি প্রকৃত উপদেষ্টা হইবারই উপযুক্ত নন। যিনি নিজে সূক্ষ্ম উপাসনার কিছুই জানেন না, তিনি কিরূপে শিষ্যকে সূক্ষ্মবিষয়ের উপদেশ করিবেন, অথবা কিরূপেই বা ক্রমে স্থূল হইতে শিষ্যকে সূক্ষ্মে লইয়া যাইবেন? যিনি নিজে অন্ধ, তিনি কিরূপে অন্য অন্ধের পথদর্শক হইতে পারেন?

উপদেষ্টা সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

গীতা ৪।৩৪।

হে অর্জ্জুন, যাঁহারা জ্ঞানী অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ এবং যাঁহারা তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মসত্তা অনুভব বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সেই সকল মহাত্মাগণকে তুমি নমস্কার দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা এবং সেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিও। তাঁহারা তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।

জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—"জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ, তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাঃ"।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও গুরু সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন, যথা,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥

ভাগবত ১১।৩।২২।

যে ব্যক্তি উত্তম এবং মঙ্গল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদাদি শাস্ত্রদর্শী, পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ এবং ব্রহ্মেতে উপশমাশ্রয়ী অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন, যে,—

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥

ভাগবত ১১।২৬।৩১।

যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে নৌকা যে প্রকার পরম আশ্রয়স্বরূপ হয়, ঘোর সংসারসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনকারী জীবগণের পক্ষে ব্রহ্মবিৎ সাধুসকলও সেইরূপ হয়েন।

শ্রুতিতেও এইপ্রকার গুরুর কথা লিখিত আছে; যথা,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।

মুণ্ডকোপনিষদ্॥ ১।২।১২ শ্রুতি।

শঙ্কর স্বামীও এইরূপ গুরুর জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান শিব গুরুকরণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন; তিনি এতদূর পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন যে, যদিও প্রথমতঃ কোন অনভিজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে উপদেশ বা মন্ত্র গ্রহণ করা হয় এবং পরে যদি কোন জ্ঞানবান্ (গুরুর) ব্যক্তির সহিত সম্মিলন ঘটে, তাহা হইলে সেই অনভিজ্ঞ গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানবান গুরুর শরণ লইবে। ইহাতে গুরুত্যাগের যে দোষ তাহা ঘটিবে না। যথা,—

অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারকং।
গুর্ব্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে॥

কুলার্ণব-তন্ত্র।

প্রথমতঃ অনভিজ্ঞ গুরু প্রাপ্ত হইয়া শিষ্য যদ্যপি পুনর্ব্বার সংশয়চ্ছেদকারক অপর গুরুতে গমন করে, তাহা হইলে সে শিষ্য গুরুত্যাগ দোষে লিপ্ত হয় না।

তিনি আরও বলিয়াছেন;—

মধু লুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরো গুর্ব্বন্তরং * ব্রজেৎ॥

কামাখ্যা-তন্ত্র।
কুলার্ণব-তন্ত্র।

মধুলোভী ভৃঙ্গগণ যে প্রকার পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞানলাভেচ্ছু শিষ্যও গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে (অর্থাৎ এক গুরু হইতে অন্য গুরুতে) গমন করিবেন।

ভগবান শিব এতদূর বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃস্মৃতঃ।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

তত্ত্বজ্ঞৈরুপদিষ্টা যে তত্ত্বজ্ঞাস্তে ন সংশয়ঃ॥
পশুভিশ্চোপদিষ্টা যে দেবি তে পশবঃ স্মৃতাঃ॥

কুলার্ণব-তন্ত্র।

---

* মন্ত্রান্মন্ত্রান্তরং ইতি পাঠান্তরম্।

উৎসব ও পাথেয়।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, বি-এল)

রেলপথে আরামদায়ক স্লিপিংকার ও রেস্তরাঁ-কারের প্রবর্ত্তক মহামতি পুল্‌ম্যান আমেরিকার রেলপথে ভ্রমণ করবার সময় তৎকালপ্রচলিত স্লিপিংকারে এক রাত্রি বাস করে নিদ্রার অভাবে বিষম কষ্টভোগ করেছিলেন। সেইরূপ কষ্টের হাত হ'তে বিশ্বের অধিবাসীকে মুক্ত কর্ব্বার জন্য তিনি নবীন আরামদায়ক স্লিপিংকার ও যাত্রীর ভোজনের জন্য রেস্তরাঁ গাড়ীর প্রবর্ত্তন করেন। তাই আজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যাত্রী সুখসেব্য গাড়ীতে বসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাদ্যদ্রব্য পেয়ে অকুতোভয়ে পরম আনন্দে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থিত স্যানফ্রান্সিস্‌কো থেকে আটলাণ্টিকের উপকূলবর্ত্তী নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছে; যাত্রীদের মনে হচ্ছে যেন তারা সুসজ্জিত হোটেলে বসে আছে আর বাতায়নতলে ছায়াচিত্রের ছবির মত ছুটে চলেছে, দীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত প্রেয়ারী(prairie) উত্তুঙ্গ রকী পর্ব্বতের বিশাল দেহ, যোজন-বিস্তৃত বনস্পতির শাখা-বাহুপল্লব, উদ্দামগতি কলরেডো নদীর পর্ব্বতমধ্যস্থ ক্ষীণ জলধারা, জলপ্রপাতের লোকবিমোহন দৃশ্য, কত কৃষকপল্লী, কত ধনজনসমৃদ্ধ মহানগরী।

পুল্‌ম্যানের মত মহাত্মা রামমোহনও আমাদের অজানা রাজ্যে যাত্রার নূতন পাথেয় নিয়ে এসে আমাদের পুরোভাগে উপস্থাপিত করেছেন। পিতা বলে, মাতা বলে, বন্ধু বলে অনন্ত করুণাময় পরব্রহ্মের চরণে আত্মনিবেদন কর্‌লে আর আমাদের কোন বিভীষিকা জীবন-পথে অগ্রসর হবে না, সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝা, সমস্ত করকাবৃষ্টি, সমস্ত দুঃখের বন্যা পলকে তিরোহিত হবে; নবীন রূপে, নবীন সুষমায়, নবীন পুষ্পে-পল্লবে জীবনপথ আস্তৃত হবে। এই অপূর্ব্ব অভিনব পাথেয় পুল্‌ম্যান-গাড়ীর মত সুখে স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবে, কোন ভয়, কোন দুঃখ আমাদের প্রাণের বীণায় আঘাত করে বেসুরা রাগিণী ঝঙ্কৃত কর্‌তে সমর্থ হবে না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে, আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে, তিমিরাবগুণ্ঠনময়ী নিশীথিনীর নিবিড় বক্ষে, অন্তরে বাহিরে বিশ্বজগতে—আমরা দেখতে পাব পরম পিতার শান্ত-নির্ম্মল-শ্রী; তাঁহারই মঙ্গল হস্ত সম্প্রসারিত দিকে দিকে; অজানার ভীতিবিহ্বলতা কাটিয়ে দিয়ে চিরপরিচিতের মোহনরূপে দণ্ডায়মান বিশ্বপিতা, অখিলমাতা, ভুবনবন্ধু।

এমনি ভাবে আত্মসমর্পণ করে পরব্রহ্মের চরণে

পাশ্চাত্য ঋষি ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজা সুখে দুঃখে উদাসীন হ'তে পেরেছিলেন, অত্যাচার উৎপীড়ন কুসুম-বর্ষণ বলে মনে করেছিলেন; অথচ এই মনীষীর অন্তরের ভাব উপলব্ধি করতে অক্ষম মানব তাঁকে mystic আখ্যা দিয়ে বিদ্রূপ করে বলেছিল—"He is either an atheist or a God-intoxicated man" যেহেতু তিনি বিশ্বময় ভগবানের সত্তা অনুভব করতেন, জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবলে পরব্রহ্মের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আজো তাঁর প্রবর্ত্তিত 'Intellectual Love of God' দার্শনিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত।

এই আত্মসমর্পণযোগে পরব্রহ্মে তদ্গতচিত্ত ভক্তবীর যবন হরিদাস বাইশবাজারের বেত্রাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করেছিলেন। আবার উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সাদর নিমন্ত্রণও উপেক্ষা করেছিলেন।

অজানার পথে যাত্রার প্রারম্ভে আমাদিগকে নিতে হবে রামমোহনের এই অপূর্ব্ব পাথেয়। তবেই জীবন ও মৃত্যুর রহস্যময় রাজ্য অতিক্রম করে আমরা অমৃত-সোপানে উপনীত হ'তে পারব।

রেলগাড়ী চলে; কিন্তু এঞ্জিনের কয়লা ফুরিয়ে যায়, জল ফুরিয়ে যায়, মাঝে মাঝে বড় বড় জংশন ষ্টেসনে থেমে, এঞ্জিনকে জল ও কয়লা সংগ্রহ করতে হয়; নতুবা গাড়ী চলতে পারবে না—পাথেয় ফুরিয়ে গেলে পথে আটকে পড়তে হবে। পুলম্যান রেস্তরাঁ-কারও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, নতুবা যাত্রীদের খাবার যোগাতে পারবে না, মাঝে মাঝে স্লিপিংকারের মলিন বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে নেয়; নূতন পোষাকে আবার বিছানা প্রভৃতি সুন্দর শোভন হয়ে উঠে।

আমাদেরও তেমনি যাতে পথের সম্বল ফুরিয়ে না যায়, অজানার পথে চলতে চলতে যেন আমরা ক্ষীয়মান পাথেয় পুনরায় সঞ্চয় করতে সমর্থ হই, তারই জন্য আর্য্য ঋষি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। মহামনীষী রামমোহনও জীবনের যাত্রাপথে উৎসবরূপ মহামিলনের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই পূত নির্ঝর-ধারা যেমন অন্যান্য নির্ঝরের জল-ধারা সংগ্রহ করে নিজের দেহ পুষ্ট করে সাগরাভিমুখে ছুটে চলে গ্রাম জনপদ ভাসিয়ে দিয়ে প্রান্তরবক্ষ শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ করে, আমরাও তেমনি উৎসবের ব্যপদেশে, ঐকান্তিক ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের সাহচর্য্যে নিজের যা কিছু ক্ষুদ্রতা, যা কিছু দৈন্য, যা কিছু ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপন্থী, তা পরিহার করে, যা সাধনের অনুকূল, ব্রহ্মনিষ্ঠার উপযোগী, সেই প্রাণবস্তু সংগ্রহ করতে পারি। যদি দেখি ঠিক পথ চিনতে পারিনি, আত্মসমর্পণের স্থানে আত্মম্ভরিতায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছে, বিপথে কণ্টক-বনে বিচরণ করছি, অমনি মহামিলনের মধ্যস্থিত ব্রহ্মপথদর্শী মহাপুরুষ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে স্নেহমাখা বচনে জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন—'পথিক তুমি পথ হারিয়েছ?' আর আমার ভ্রম সংশোধন করে, আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন অজানার পথে; আবার সেই পাথেয় সম্বল করে জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য অবলীলায় সহ্য করতে সমর্থ হব, শত বিপদেও কাতর হবার কোন লক্ষণ দেখা যাবে না।"

উৎসবে মহামিলনের অবসানে যখন আবার পথচলা সুরু হবে, তখন দেখব দিকে দিকে প্রভাতের বিহগ-কাকলী আমাদিগকে অভিনন্দিত করছে; বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুমরাশি আকাশে বাতাসে সৌরভলিপি প্রেরণ করছে, সুপ্ত হৃদয়ের নীরব সিংহাসনে পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হেসে উঠছে পৃথিবী ফলে ফুলে, আলোকে শিশিরে, নবীন সম্পদসম্ভারে। আনন্দের অপূর্ব্ব পাথেয় জীবনকে ভাদ্রের ভরা নদীর মত কূলে কূলে পরিপূর্ণ করে তুলেছে; জীবনের যা কিছু নীরবতা, যা কিছু কাঠিন্য, যা কিছু অপূর্ণতা আনন্দের অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে নূতন রূপ ধরে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; যেন কার অশরীরী মন্ত্র-ঝঙ্কারে শয়নে স্বপনে, ভোজনে গমনে, দিবসের কর্ম্মকোলাহলে, উষার সিন্দূরবিন্দুর মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত দ্বন্দ্ব নিরসন করে, অবিরাম কর্ণকুহরে ধ্বনিত হচ্ছে—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"।

কে আছে অলস, কে আছে নিশ্চেষ্ট, কে আছে পথভ্রষ্ট, কে আছে উদাসীন, কে আছে জীবন্মৃত—এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কোমল শয্যায় সুখ-শয়নে নিদ্রিত থাকতে পারে?

এই মহামিলনে পাথেয় সঞ্চয় করতে করতে, ভুল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, একদিন মহামহানের বিশ্বব্যাপী মিলনোৎসবে উপনীত হতে পারব, যেদিন প্রাণে প্রাণে অনুভব করব—হে প্রভো, এ বিশ্বসংসারের যা কিছু ধনজন-সুখৈশ্বর্য্য সবই অকিঞ্চিৎকর, সমস্তই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে স্থৈর্য্যময়ী নীরবতায় বিলীন হয়ে যাবে; তুমিই একমাত্র সার; আমায় অন্ধকারময় জীবন-পথে আলোক-বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

"নিয়ে চল আমাকে সে মিলনোৎসবে—যেখানে দিগাঙ্গনার মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছে দিকে দিগন্তরে, লোকে লোকান্তরে ঘোষণা করে আনন্দের অমৃতময়ী বাণী; সে উৎসবে ছুটে চলেছে সুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ, নিত্যকাল ধরে আকাশগঙ্গার কূলে কূলে দিক-দিগন্তব্যাপী অসীম ছায়াপথের ধারে ধারে ছুটে চন্দ্র তপন তারা; যে উৎসবের সাড়া পেয়ে বিজন-বনপ্রান্তে পূতবক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছে বন্যযূথিকামুকুল; যে উৎসবের গুণগান করে পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে ছুটে চলে

ঘিরেকমালা; নৈশাকাশ বিপ্লাবিত করে পাপিয়ার করুণ সঙ্গীতলহরী যে উৎসবের বোধনগানে নিরত; যে উৎসবের আনন্দধ্বনি চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে; যে অনন্ত উৎসবক্ষেত্রে সমুদ্ভূত অপরিসীম আনন্দের কণা মাত্র পেয়ে যোগীর হৃদয়কন্দর আনন্দে স্পন্দিত; ভোগীর বিলাসপ্রাঙ্গণ আলোকোজ্জ্বল, রোগীর ক্ষীণায়মান অধর হাস্য-রেখায় উদ্ভাসিত; যে উৎসব জননীর বক্ষ স্নেহধারায় পরিপূর্ণ করে রেখেছে, শিশুর রক্তিম অধরে অস্ফুট ভাষা দিয়েছে, মাতার প্রাণে করুণার সঞ্চার করেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের হৃদয়নিহিত ভাবধারা আজো ছুটে চলেছে যে উৎসব-অঙ্গনতলে সঞ্চরমান মেঘমালা ভেদ করে ঊর্দ্ধ্ব হ'তে ঊর্দ্ধ্বতরলোকে; অকৃতী, অধম, সাধন-শক্তিবিহীন সংসার-গহন-বনে পথহারা, কণ্টকতরুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত-দেহ, হিংসাদ্বেষ-ঝটিকা-সন্তাড়িত উৎক্ষিপ্ত মরুবালুকার অভ্যন্তরে আকণ্ঠনিমজ্জিত আমি —আমাকে তোমার অপূর্ব্ব মিলনোৎসবে নিয়ে চল; অন্তরে আনন্দের কণামাত্র সঞ্চারিত করে জীবন্মৃত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন কর।

যে দিবস এই মিলনোৎসবের মধ্য দিয়ে সেই মিলনোৎসবের ছবি প্রাণে প্রতিবিম্বিত হবে, সেই দিনই সার্থক হবে আমাদের এই জাগতিক উৎসব, আমাদের পার্থিব মিলন।

আষাঢ়ের শান্ত সন্ধ্যা; বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা শ্যামল পত্রপুঞ্জে, সতেজ পুষ্পবীথিকায়, নবীন তৃণাঙ্কুরে নিপতিত হচ্চে। এই বৃষ্টিধারার মত পরব্রহ্মের অনন্ত করুণাধারা উৎসব-প্রাঙ্গণতলে সাধকমণ্ডলীর প্রাণে প্রাণে বর্ষিত হোক; বৃষ্টিধারা-স্পর্শে যেমন ধরণীর উষ্ণতা মন্দীভূত হয়, তেমনি ভগবানের অপার আনন্দ ভক্তবৃন্দের হৃদয়নিহিত দুঃখ-অশান্তি-দাবানল-প্রশমিত করে বিমল শান্তির অমিয় নির্ঝরধারা ফুটিয়ে তুলুক। হে পরমাত্মন্, তোমারই অপূর্ব্ব বর্ণনাতীত জ্যোতি হৃদয়গুহার তিমিররাশি দূরীভূত করে, তাকে জ্ঞান-বৈরাগ্য-শ্রী-বিমণ্ডিত করে তুলুক। তোমার করুণায় আমাদের উৎসব সফল হোক।

হিন্দু-দণ্ডনীতি।

স্তেয়।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

'স্তেয়' শব্দে চৌর্য্য বুঝায়। বর্দ্ধমানের মতে "অনৈয়ায়িকং পরস্বগ্রহণং" অন্যায় মতে পরদ্রব্যগ্রহণ, ইহারই নাম চৌর্য্য। ডাকাতির সঙ্গে চৌর্য্যের পার্থক্য এই,—রক্ষীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক অপহরণের নাম ডাকাতি বা সাহস। "নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং" অর্থাৎ রক্ষীপুরুষের অজ্ঞাতসারে অপহরণের নাম স্তেয় বা চৌর্য্য। চোর আবার দুই ভাগে বিভক্ত—প্রকাশ-তস্কর, অপ্রকাশ-তস্কর। প্রকাশ-তস্কর বলপ্রয়োগ না করিয়া ছলপ্রয়োগ করিয়াই পরদ্রব্য অপহরণ করে। অপ্রকাশ-তস্কর "সুপ্ত-মত্ত-প্রমত্ত-আর্ত্তানাম্ অপ্রকাশম্ অপেক্ষ্য অপহারাৎ" অর্থাৎ নিদ্রিত, উন্মত্ত, মাদকসেবনে লুপ্তজ্ঞান, রোগ-শোক-দারিদ্র্যে কাতর ব্যক্তির হতচেতনার সুবিধা পাইয়া যাহারা অপ্রকাশ হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে চুরি করে, তাহারা অপ্রকাশ-তস্কর।

রাস্তায় যাইতে যাইতে যাহা কুড়াইয়া পাওয়া যায়, তাহা যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং সাবধানে রাখিবে। কুড়াইয়া লইলেই চুরি হয় না।

অন্যহস্তাৎ পরিভ্রষ্টম্ অকামাৎ উদ্ধৃতং পথি।
চৌরেণ বা প্রক্ষিপ্তং লোপ্ত্রং যত্নাৎ পরীক্ষয়েৎ॥

অপরের হস্ত হইতে যাহা পরিভ্রষ্ট হয়, এবং উহা চুরি করিব না (অকামাৎ) এইরূপ মানসে যদি উহা কুড়াইয়া লওয়া হয়, অথবা চোরে যাহা রাস্তায় ফেলিয়া যায়, তাহা যদি হস্তগত হয়, যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

যে ব্যক্তি চোরকে বা হত্যাকারীকে জানিয়া শুনিয়া ভাত (অন্ন), বাসস্থান, শীতনাশের জন্য অগ্নি, তৃষ্ণানাশের জল বা চুরি করিবার উপদেশ বা মন্ত্র দিয়া সাহায্য করে বা চুরি করিবার জন্য যাতায়াতের পাথেয় দেয়, সে-ও দণ্ডনীয় হইবে। যথা—

ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদকমন্ত্রোপকরণব্যয়ান্।
দত্বা চোরস্য হন্তুর্বা জানতো দণ্ড উত্তমঃ॥

প্রভু দ্বারা নিযুক্ত হইয়া যদি ভৃত্য কোন অন্যায় কার্য্য করে, তবে প্রভুই দণ্ডনীয় হইবে—ভৃত্য নহে। বৃহস্পতির বচন এইরূপ—

প্রভুণা বিনিযুক্তঃ সন্ ভৃতকো বিদধাতি যঃ।
তদর্থম্ অশুভং কর্ম্ম স্বামী তত্রাপরাধ্নুয়াৎ।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে প্রজার মধ্যে যদি কাহারও ধন অপহৃত হয়, তাহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য রাজা স্বয়ং দায়ী। যদি চোরাই মাল পাওয়া যায় তাহা

হইলে রাজা যাহার ধন অপহৃত হইয়াছে তাহাকে সমস্তই দিয়া দিবেন। নিধি অর্থাৎ বহুমূল্য প্রস্তরাদি অপহৃত হইলে যদি তাহা রাজকর্মচারীগণের চেষ্টায় উদ্ধার হয়, তাহা হইলে রাজা উহার মধ্য হইতে নিজ ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক বক্রী নিধি যাহার অপহৃত হইয়াছে তাহা তাহাকে দিয়া দিবেন। অপহৃত দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা ফেরৎ দিবার সময় যদি প্রকৃত মালিক সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ মালিককে দিয়া শপথ করাইতে হইবে (কতকটা affidavitএর মত) অথবা তাহার বন্ধুবান্ধবকে দিয়া স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

প্রকাশ-তস্করের কথা যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বণিক তাহার অন্তর্গত। বণিক আবার দুই ভাগে বিভক্ত ; একদল ক্রয়-বিক্রয়োপজীবী আর এক দল দ্রব্যনির্ম্মাণ-উপজীবী অর্থাৎ কারিকর (trader and manufacturer)।

যে বণিক বিক্রেয় বস্তুর ওজনে কৃত্রিম বাটখারা ব্যবহারে ক্রেতাকে প্রতারিত করে, সে পূর্ব্ব (প্রথম) শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অর্থাৎ তাহার জরিমানা ২৪ পণ হইতে ৯১ পণ পর্য্যন্ত হইবে।

> অল্পমূল্যং তু সংস্কৃত্য নয়ন্তি বহুমূল্যতাম্।
> স্ত্রী-বালকান্ বঞ্চয়ন্তি দণ্ড্যাস্তে হর্থানুসারতঃ ॥
> হেমমুক্তা প্রবালাদ্যং কুর্ব্বতে কৃত্রিমং তু যে।
> ক্রেত্রে মূল্যং প্রদাপ্যাস্তে রাজ্ঞে চ দ্বিগুণং দমম্ ॥

অর্থাৎ অল্পমূল্য দ্রব্যকে সংস্কার করিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে বহুমূল্য বলিয়া স্ত্রী বা বালককে বিক্রয় করে এবং তাহাদিগকে এইরূপে প্রতারিত করে, প্রাপ্ত মূল্য অনুসারে সে দণ্ডনীয় হইবে। যে ব্যক্তি স্বর্ণ মুক্তা বা প্রবাল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিয়া ঐ ঝুটা মাল পরকে বিক্রয় করে, তাহাকে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে হইবে এবং শাস্তিস্বরূপে রাজাকে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য জরিমানা দিতে হইবে।

> সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারং তু পার্থিবঃ।
> প্রবর্ত্তমানম্ অন্যায়ে ছেদয়েৎ লবশঃ ক্ষুরৈঃ ॥

যে কৃত্রিম সোনা প্রস্তুত করে, সে প্রকাশ-তস্করের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম। রাজা তাহাকে ক্ষুর দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবেন, ইহা মনুসম্মত। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাহার ত্রি-অঙ্গচ্ছেদ (নাসা কর্ণ ও হস্ত) করিবে। পারদাদি যোগে কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার আভাস এইখানে পাওয়া যায়।

> মৃৎ-চর্ম্ম-মণি-সূত্রায়ঃ-কাষ্ঠ-পাষাণ-বাসসাম্।
> অজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয় অষ্টগুণো দমঃ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অল্পমূল্য বস্তুকে বাহ্যিক ভাবে বহুমূল্য বস্তুর সদৃশ করিয়া ক্রেতাকে প্রতারিত করে, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৮ গুণ জরিমানা হইবে। কৃষ্ণ মৃত্তিকায় কস্তুরিকার (মৃগনাভির) গন্ধ-প্রলেপ করিয়া মৃগনাভি বলিয়া বিক্রয়, বিড়াল-চর্ম্মকে পালিশ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম বলিয়া বিক্রয়, সাধারণ কাঁচকে লাল রঙ দিয়া পদ্মরাগ-মণি বলিয়া বিক্রয়, তুলার কাপড়ে রঙ লাগাইয়া রেশমী কাপড় বলিয়া বিক্রয়, লোহার দ্রব্য মাজিয়া ঘষিয়া রূপার দ্রব্য বলিয়া বিক্রয়, বেলকাঠে চন্দনপ্রলেপ করিয়া চন্দনকাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই দণ্ডার্হ। প্রাচীন সময়ে এই সমস্ত চাতুরী সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের ও রাজার যেরূপ প্রখর দৃষ্টি ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সে ভাবে রাজার দৃষ্টি আছে কিনা সন্দেহ। হাতুড়ে চিকিৎসকও একভাবে প্রবঞ্চক ও তস্করের সামিল। তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

> অজ্ঞাতৌষধি-মন্ত্রস্তু যশ্চ ব্যাধেরতত্ত্ববিদ্।
> রোগিভ্যো হর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্যশ্চৌরবৎ ভিষক্ ॥

যাহারা ব্যাধির তত্ত্ব ও ঔষধসম্বন্ধে অজ্ঞ অথচ রোগীর নিকট চিকিৎসাচ্ছলে অর্থ গ্রহণ করে, সে চোরের ন্যায় দণ্ড পাইবার যোগ্য। যাহারা অজ্ঞ হইয়া পশু-চিকিৎসা করে, তাহাদের প্রথম সাহস দণ্ড (২৪ হইতে ৯১ পণ)। যাহারা অজ্ঞ হইয়া মনুষ্যচিকিৎসা করে, তাহাদের মধ্যম সাহস দণ্ড (দুইশত হইতে পাঁচ শত পণ)। যাহারা অজ্ঞ হইয়া রাজ-পুরুষগণের চিকিৎসা করে, তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে (অর্থাৎ ছয়শত হইতে হাজার পণ দণ্ড হইবে)। উপরিউক্ত সমস্ত দণ্ডগুলি প্রদত্ত হইবে, যদি রোগী না মরে। মরিলে আরও গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

উৎকোচদানের দণ্ড।

রাজার সভ্য অর্থাৎ সভাসদ্গণ যদি অর্থলোভে মিথ্যা কথা বলেন বা উৎকোচ গ্রহণ করেন, অথবা লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করেন, নির্ব্বাসনই তাহাদের দণ্ড।

> অন্যায়বাদিনঃ সভ্যাঃ তথৈবোৎকোচজীবিনঃ।
> বিশ্রব্ধবঞ্চকাশ্চৈব নির্ব্বাস্যাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ বৃহস্পতি।

মনুর মতে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ দণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাহাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড।

দ্যূতকার-দণ্ড।

দ্যূতক্রীড়া দ্বিবিধ। অপ্রাণী বা অচেতন বস্তু অর্থাৎ টাকাকড়ি প্রভৃতি লইয়া যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে

'দ্যূত' বলে; প্রাণী অর্থাৎ পারাবত কুক্কুট প্রভৃতি বা মেষ মানুষ প্রভৃতি লইয়া যে ক্রীড়া হয়, তাহাকে 'সমাহ্বয়' বলে। কেবল দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য রাজার অনুমতি লইয়া প্রজা করিতে পারে, অন্যথা নহে। দ্যূতক্রীড়কের দণ্ড চোরের ন্যায়। অধিকন্তু দ্যূতক্রীড়ককে তাহার অর্জ্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইত।

শঠ জ্যোতির্ব্বিদের দণ্ড।

যে ব্যক্তি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অজ্ঞ, অথচ অর্থের লোভে লোকের প্রত্যয় জন্মাইয়া মিথ্যা জল্পনা করে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থ অনুসারে দণ্ড হইবে।

রজকের দণ্ড।

যে রজক মসৃণ ফলকের উপর ধীরে ধীরে বস্ত্র কাচিবে, তাহার এক ধৌপ্য মাসক দণ্ড হইবে। রজক যদি কাচিবার জন্য প্রদত্ত বস্ত্রাদি নিজে ব্যবহার অর্থাৎ পরিধান করে, তবে তাহার দণ্ডের পরিমাণ তিন পণ।

ঔপাধিক দণ্ড (False inducesment)।

রাজা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আমাকে টাকা দাও, আমি রাজাকে শান্ত করিব, এইরূপ বা এবংবিধ উপায়ে যাহারা অর্থসংগ্রহ করে, তাহাদিগকে ও তাহাদের সহায়ীভূত লোক-সকলকে প্রকাশ্য স্থানে অঙ্গচ্ছেদাদিপূর্ব্বক হত্যা করিবে।

শিক্ষকাদির দণ্ড।

যে ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া পরে কোন ব্যক্তিকে বিদ্যা বা শিল্প না শিখায়, তাহাকে তাহার গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

মান্ত্রিক-তান্ত্রিকের দণ্ড।

যাহারা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঔষধি প্রয়োগ করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে চায়, ও কেবলমাত্র বশী-করণ প্রয়োগ করে তাহাদের নির্ব্বাসন দণ্ড।

ভণ্ড সন্ন্যাসীর দণ্ড।

যাহারা দণ্ড ও অজিনের (মৃগচর্ম্মের) সাহায্যে আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া প্রকাশ করে এবং কৌশলে অর্থসংগ্রহ করে, তাহাদের বধদণ্ড হইবে।

অপ্রকাশ-তস্কর অর্থাৎ যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে চুরি করে ও যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা বিবিধ। এক প্রকার হইতেছে সিঁদেল চোর। আর এক প্রকার হইতেছে বনবাসী চোর। বৃহস্পতির মতে অপ্রকাশ-তস্কর পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সিঁদেল, পথিকের ধনাপহরণকারী, পুংস্কের পশুপক্ষী অপহারক, উৎক্ষেপক ও শস্যহর। উৎক্ষেপক শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি অপরের মুখে বস্ত্রক্ষেপণ করিয়া অপহরণ করে। ব্যাসের মতে আরও চরি প্রকার চোরের উল্লেখ আছে। চোর যদি সিঁদ কাটিয়া কিছু না পায় বা যৎসামান্য পায়, তাহা হইলেও তাহার দণ্ডের তারতম্য হইবে না। চোর ধৃত হইলে তাহাকে চোরাই-মাল ফেরত দিতে হইবে এবং রাজা তাহার সম্বন্ধে শূলদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীহর্ত্তা অর্থাৎ পরের স্ত্রী অপহরণ করে, তাহাকে লোহার খাটে শোয়াইয়া অগ্নিদগ্ধ করিবে। যে মানুষ চুরি করে, তাহার হাত-পা কাটিয়া রাজপথে দাঁড় করান হইবে। যে গোহর্ত্তা অর্থাৎ গরু চুরি করে, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া পরে তাহাকে বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া মারিবে। সাধারণ পশু হরণ করিলে তাহার পায়ের অর্দ্ধেক তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। উৎক্ষেপকের ও গ্রন্থিভেদকের দণ্ড তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীচ্ছেদন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের চুরি তিন ভাগে বিভক্ত। মাটির ভাঁড়, কাষ্ঠ, চর্ম্ম, তৃণ, শমীধান্য ও প্রস্তুত অন্ন অপহরণ, ইহা হইল ক্ষুদ্র চুরি। মধ্যম চুরি হইতেছে রেশমের বস্ত্র বাদে সর্ব্ববিধ বস্ত্র, গরু ব্যতীত সর্ব্ববিধ প্রাণী, এবং স্বর্ণ ব্যতীত সর্ব্ববিধ ধাতুদ্রব্য অপহরণ। উত্তম চুরি হইতেছে স্বর্ণ, রত্ন, রেশমের বস্ত্র, স্ত্রী-পুরুষ, হস্তী, অশ্ব, দেবতা ব্রাহ্মণ ও রাজার জিনিস অপহরণ। হৃত দ্রব্যের মূল্য একশত টাকার অধিক হইলে এবং ঐ বস্তু ব্রাহ্মণের হইলে অপরাধীর বধদণ্ড ব্যবস্থা। অপহৃত বস্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির হইলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড হইবে। মধ্যম দ্রব্য অপহরণের জন্য অর্থদণ্ড হইবে; অধিকন্তু চোরকে অপহৃত বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বস্তু অপ-হরণের জন্য অর্থদণ্ড-ব্যবস্থা।

পরদারাভিমর্ষণ।

পরদার অর্থে নিজ ভার্য্যা ব্যতীত স্ত্রী। পরস্ত্রী সংগ্রহ (kidnapping and abduction) তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। ছলে, বলে এবং অনুরাগে। স্বজনাভিগম (incest) সম্বন্ধে লিঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা। উত্তম বর্ণের পরদারাভিগমনের শাস্তি দোষীকে ধরিয়া কুকুরকে দিয়া তাহাকে খাওয়াইবে।

কন্যাদূষণ দণ্ড।

অবিবাহিত কন্যাগমনে স্বজাতীয় কন্যাধর্ষণ-কারীর দণ্ড তাহার দুই অঙ্গুলিচ্ছেদ। উত্তমজাতীয়া কন্যাধর্ষণের দণ্ড সর্ব্বস্বহরণ ও বধদণ্ড।

কন্যাহরণ অপরাধ।

উত্তম বর্ণের কন্যাঅপহরণে দোষীর বধদণ্ড। স্বজাতীয় হইলে ও কন্যা অনুরাগিণী হইলে বিশেষ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই; কেননা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ঘটিতে পারে।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

(শ্রীরত্নবালা দেবী)

মানবজীবনের শিক্ষাই মূলভিত্তি। শিক্ষার বলেই মানব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কি নর কি নারী, শিক্ষা মানব মাত্রেরই প্রয়োজন। মানুষকে মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে গেলে শিক্ষাই তাহার প্রধান সহায়। মানবজীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষাই তাহার একমাত্র সদুপায়। কিন্তু পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের পিতামাতারা বিদ্যাশিক্ষার সাফল্য কি, বোধ হয় জানিতেন না; সেই জন্য নারীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিতও মনে করিতেন না। শত বৎসর পূর্ব্বে যে, নারীসমাজ এক প্রকার নিরক্ষর ছিল, এ কথাটি বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু তখনকার নারীদিগের শোচনীয় অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিন। এক্ষণে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নারীজাগরণের দিন আসিয়াছে। নারীরা নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াছে। আমাদের দেশে এই নারীশিক্ষার বিস্তৃতির জন্য যদিও অনেক স্কুল-কলেজ সংস্থাপন হইয়াছে বটে, তথাপি নারীশিক্ষার অভাব-অসম্পূর্ণতা এখনও অনেক আছে। সহরের মধ্যে স্থানে স্থানে নারীশিক্ষার জন্য দু'দশটি বিদ্যালয় থাকিলেও পল্লীগ্রামে এখনও নারীশিক্ষা প্রসার লাভ করে নাই। পাশ্চাত্য দেশের নারীশিক্ষার তুলনায় আমাদের দেশ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সহরের নারীশিক্ষার তুলনায় পল্লীগ্রামের নারীর অবস্থা অনেক হীন, তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। যতদিন ভারতে নারীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিস্তার না হইবে, ততদিন নারীসমাজের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত।

দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের দেশের পিতামাতারা পুত্রকন্যার শিক্ষার পার্থক্য রাখেন। এই শিক্ষার পার্থক্যই নারীদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছে। নারী যে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন, এখনকার দিনে তাহার শত শত নিদর্শন আছে। আমাদের দেশে শিক্ষার অভাবেই নারীজাতির হীনাবস্থা হইয়াছে। তাই মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষা সমান ভাবেই হওয়া দরকার।

তবে পুরুষের শিক্ষার সহিত নারীশিক্ষার কিছু পার্থক্য আছে। নারীপুরুষ লইয়াই মানবসমাজ। যদি বাস্তবিক মানবসমাজের পুষ্টিসাধন করিতে হয়, তবে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের শিক্ষার প্রয়োজন। কেননা নারীপুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়াই যখন সংসারধর্ম্মের সমাজধর্ম্মের পরিপুষ্টি সাধন হয়, তখন নারীপুরুষ উভয়কেই সমাজের অঙ্গ বলিতে হয়। অতএব একের উন্নতিতে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ হইতে পারে না। মানবসমাজের পুষ্টি ও বল-শক্তি-সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষার আবশ্যক। নতুবা মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ হইতে পারে না। দেহের এক অঙ্গের পুষ্টি হইলেও অপর অঙ্গ পঙ্গু হইয়া থাকে। এজন্য মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন করিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষায় সমান অধিকার হওয়া চাই।

সেকালে সাধারণ লোকের মধ্যে এত শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। বিদ্যার সার্থকতা তখন লোক বুঝিতে পারে নাই, এজন্য পুত্রকন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া যে উচিত, তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না। পুত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পিতামাতার ভরণপোষণ করিবে, কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়াই নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। নারীদের যে জগতে শত শত কর্ত্তব্য আছে, সেকালের পিতামাতাগণ তাহা জানিতেন না। কিন্তু জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীগণ বুঝিলেন, তখন নারীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই বিদ্যাসাগরের যুগ হইতে নারীশিক্ষা প্রসার লাভ করিল। শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষ মহামতি বেথুন সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় ও যত্নে নারীশিক্ষার সূত্রপাত হইল। মহাত্মা বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মহাত্মাগণের অসীম যত্নে ও বিপুল উদ্যমে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য মহাত্মা বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক বেথুন স্কুল স্থাপিত হইল। তাহার পূর্ব্বে হিন্দুরমণীর শিক্ষার জন্য কোন স্কুল-কলেজের সৃষ্টি হয় নাই। আমরা সেই মহাপ্রাণ বেথুনের কৃপায় আজ নারীশিক্ষার কিছু কিছু উন্নতি দেখিতেছি। বালিকাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পুষ্টির সহিত মনের মধ্যে যে সকল নব নব আশা উদ্যম জাগিয়া উঠে, তাহারা বাল্যজীবনের প্রারম্ভেই বিবাহিত হইয়া স্বামীগৃহে গমন করায় তাহাদের হৃদয়ের সেই সুখের স্বপ্নগুলি কোথায় ভাসিয়া যায়। প্রভাত-অরুণস্পর্শে যেমন শিশিরবিন্দুগুলি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাল্যজীবনেই বিবাহিত হইয়া স্বামীগৃহে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই বালিকাদের মনের আশা ও উদ্যম একে একে শুকাইয়া যায়। বাল্যে স্বাধীন মনোবৃত্তিগুলিতে বাধা পড়ায় বালিকাজীবনের আনন্দউৎসাহগুলি এককালেই নষ্ট হইয়া যায়। অন্ততঃ নারীজাতির

বিবাহ চৌদ্দ বৎসরের কমে দেওয়া উচিত নহে। নারী শিক্ষা লাভ করিয়া যখন জননী ও গৃহিণী হইবার উপযুক্ত হইবেন, তখনই তাঁহাদের বিবাহকাল প্রশস্ত। নারীদিগের দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক বিকাশ যতদিন না হয়, ততদিন বিবাহ না দেওয়াই উচিত। কেন না, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কর্ত্তব্যভার নারীকে বহন করিতে হয়; এজন্য বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের পিতৃগৃহে থাকিয়া সুশিক্ষা লাভ করা দরকার। নারীকে জননীর মহিমাময় পদে আরূঢ় হইয়া সন্তানপালনের কঠোর দায়িত্বভার বহন করিতে হইবে। মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ পরিণতি। সুশীলা মাতা হইতেই সৎ পুত্রের উদ্ভব হয়। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক সদ্বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তোলা আবশ্যক। বালিকাদের বাল্যজীবনের আশা, উদ্যম ও স্বাধীন মনোবৃত্তিগুলি পূর্ণ বিকশিত না হইতেই অধিকাংশ স্থলে কোন্ অজ্ঞাতের কোলে তাহারা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইহার প্রকৃত কারণ নারীশিক্ষার অভাব ও অসম্পূর্ণতা। শিক্ষাই নারীকে জ্ঞানের ও কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেয়। শিক্ষাই জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার জন্য বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও যে শিক্ষার সম্যক বিস্তৃতি হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। নারীসমাজের শিক্ষাবিষয়ে এখনও অনেক অভাব আছে। তবে আমাদের মতে নারীপুরুষের শিক্ষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা চাই। কেননা, নারী জগতের মাতা— জগতের জননী। নারীজীবনের পূর্ণ পরিণতিই মাতৃত্বে। এজন্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ে যাহাতে স্নেহদয়া ভক্তিমমতা ভালবাসা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি বিকশিত হইয়া উঠে, তাহারও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। নারীশিক্ষা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিসমাপ্ত নহে,—নারীর শিক্ষা কর্ত্তব্যপালন, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালন, সন্তানপালন, রোগী-চর্য্যা ও গুরুজনসেবা এবং গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যরক্ষা। এইগুলি নারীশিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীর গার্হস্থ্য নীতিশিক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক।

নারী সুগৃহিণী ও সংসারে লক্ষ্মীরূপিণী হইয়া স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল দিয়া, রোগে সেবা, শোকে শান্তি হইয়া আমাদের দরিদ্র বঙ্গগৃহের অভাব-অশান্তি দূর করিয়া অস্বচ্ছলতাপূর্ণ বঙ্গসংসারে সুখশান্তি পবিত্রতা আনয়ন করিয়া নিরানন্দময় সংসারে আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিবেন, ইহাই প্রার্থনীয়। নারী বিবাহিত হইলেই মাতৃত্বের মহিমায় পত্নীত্বের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকেন। বিবাহের পর স্বামীগৃহে আসিয়া নারীর আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। নারী তখন নিজের অস্তিত্ব পরিজনবর্গের সহিত মিশাইয়া দেন। বঙ্গসংসারে নারী স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে মন্ত্রী ও পরিচর্য্যায় সেবিকা। নারীর জীবন পরার্থে—স্বার্থে নহে। যে শিক্ষায় নারী কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া গুরুজনসেবানিরতা হইয়া সৎপুত্রের জননী হইয়া নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, যে শিক্ষায় নারী সংযমপরায়ণা দয়াময়ী হইয়া রোগে-শোকে সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে অবিচল হইয়া স্বামীসেবায় ধন্য হইতে পারেন, তাহাই নারীর শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য অনুকরণের ফলে নারীসমাজে বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী শিক্ষায় বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদের অনুকরণে তাঁহাদের সংযম নষ্ট হইতেছে; এবং জননীর আদর্শে তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণও বিলাসী হইয়া উঠিতেছে। বিদুষী ভগিনীগণ এবিষয়ে সংযম-পরায়ণ হইলে নারীসমাজের কল্যাণসাধন হইবে।

প্রকৃতভাবে শিক্ষা লাভ করিতে গেলে নারীকে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীনীতি ও নারীধর্ম্ম এবং নারীজনসুলভ গুণগ্রাম কি, তাহা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সংযম সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রভৃতি গুণেও নারীকে ভূষিত হইতে হইবে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের শিক্ষায় পার্থক্য থাকিলেও নারীশিক্ষা নিতান্ত সহজ নহে। পুরুষদিগের শিক্ষা যেমন নানা জটিল বিষয়ে পূর্ণ, তেমনি স্ত্রীশিক্ষাতেও বহু দায়িত্ব আছে। পুরুষ অর্থোপার্জ্জন করিয়া বাহিরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণ প্রভৃতির জন্য যেমন দায়ী, তেমনি নারীও গৃহসংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও পরিজনবর্গের সুখশান্তি বিধান করিতে বাধ্য। শুধু বিদ্যাশিক্ষায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভে নারীশিক্ষার পূর্ণতা ও সাফল্য হয় না। কর্ত্তব্যই নারীর তপস্যা। নারী সংসারে সৎপুত্রের মাতা হইয়া আদর্শ গৃহিণী হইয়া আদর্শ জননী হইয়া সুখ শান্তি আনন্দ আনয়ন করিয়া সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবেন। ইহাই নারীজীবনের সাফল্য। ইহার বিপরীত ভাব হইলে নারীর জীবনে শান্তিসুখ থাকে না। পত্নী উপরোক্ত গুণবতী না হইলে পতিও সংসারে সুখী হইতে পারেন না; এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সুখস্বচ্ছন্দতাও থাকে না। নারীরা নিজের সরলতা কোমলতা প্রেম ও ভালবাসার মাধুর্য্যে পুরুষদিগের জীবন উদ্বোধিত ও সরল করিয়া রাখিতে না পারিলে দাম্পত্যজীবনের সুখশান্তি থাকে না। নারীর দায়িত্ব সংসারে পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী। সন্তানপালন রোগীচর্য্যা গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি কার্য্যগুলিতে নারীর বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়ো-

জন। শিক্ষার অভাব হেতু নারীদের সন্তানপালনের অনভিজ্ঞতায় সূতিকাগারে বহু শিশুর জীবন নষ্ট হয়। নারী বিশ্বের জননী হইয়া বিশ্বকে ভালবাসিবেন ও বিশ্বের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সংসারসংগ্রামে তাঁহাকে জয়ী হইতে হইবে। আমাদের সমাজ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু ধর্ম্মকে মূলভিত্তি করিয়া নারীর শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের নারীসমাজে জাতীয় ভাবের শিক্ষাই প্রয়োজন। ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে চরিত্রে প্রতিভায় নারীর নারীত্বের গৌরব ও মর্য্যাদা ফুটিয়া উঠা দরকার। আমরা তাই সীতার মত সাবিত্রীর মত পতি-প্রাণা, বেহুলার মত ফুল্লরার মত পতিপ্রেমবিমুগ্ধা, সতীর মত গৌরীর মত পুণ্যপূতা ভারতনারীর মহান্ আদর্শ দেখিতে চাই। আমাদের দেশের নারীর স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে অর্দ্ধাঙ্গিণীরূপে পত্নীরূপে পতির সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যতা লাভ করা চাই। তাই নারীশিক্ষায় দৃঢ়তা সংযম ও ত্যাগের স্থান থাকা চাই। নারী শুধু বসনেভূষণে বিলাসে গা-ঢালিয়া দিলে নারীত্বের বিকাশ হইবে না। খ্যাতনামা কবি নবীন সেন তাই স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

> রোগে শান্তি দুঃখে দয়া
> শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া।

এখন চাই নারীর জাগরণ, চাই নারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, চাই নারীর সংযম।

আত্মসম্মান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজকাল একটা ঢং উঠিয়াছে নিজেকে খুব নীচু করিয়া বলা। এটা নাকি মস্ত বিনয়। অবশ্য মনে যতটা বিনয় জাগ্রত হউক বা না হউক, মুখে দেখানো চাই। কলিকাতায় একজন মস্ত ধনী লোকের গৃহে কেহ অতিথি হইলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন—এ সমস্তই আপনার। তিনি নিশ্চয়ই ইহা মুহূর্ত্তেরও জন্য ভাবিতেন না যে, অতিথি সত্যই স্থির ধারণা করিবেন যে, সেই ধনীর প্রাসাদ ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার হইয়া গেল। তবু অতিথির নিকট ঐ প্রকার বলা অল্পবিস্তর শোভন হইতে পারে। কিন্তু যখন তখন বৃথা মৌখিক বিনয়-প্রকাশ শোভন তো নয়ই, বরঞ্চ অনেক সময়েই বিরক্তি-কর হইয়া উঠে।

এই প্রকার বিনয়ের উদ্ভব সম্ভবত চৈতন্যদেবের সময় অবধি হইয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যতর প্রধান ভাব ছিল—

> অমানিনা মানদেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

যে ব্যক্তি নিজে মানের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না, কিন্তু অপরকে সর্ব্বদাই মান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে; লোকের অত্যাচার, নিন্দা প্রভৃতি তরুর ন্যায় একটী কথা না বলিয়া অম্লানবদনে সহ্য করিবে এবং আপ-নাকে নীচ হইতেও সুনীচ বিবেচনা করিবে, সে-ই প্রকৃত হরিকে ভজনা করিবার উপযুক্ত পাত্র। কথাটী বড়ই উচ্চদরের কথা এবং যাঁহার মুখারবিন্দ হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর হইতেই ইহা বাহির হইয়াছিল, স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার পর শিষ্যপরম্পরায় এই ভাবটী যে আকারে নামিয়া আসিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে তাহা অনেক স্থলেই ভক্ত-ভণ্ডামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; হাতে মালা জপিব, মুখে হরিনাম বলিব, আর অন্তরে অধমর্ণের নিকট সুদ কত প্রাপ্য তাহারই হিসাব করিব, এই ভাবের ভণ্ডামিতে দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার ভণ্ডামির কারণে বৈষ্ণব অনেকের নিকট হেয় দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবীয় বিনয়ভাবের উচ্চতা উপলব্ধি করিয়া তাহারই অনুকরণে নব্যযুগে কোন ধর্ম্মসংস্কারক উহার প্রচারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরের পদধূলিগ্রহণের আতিশয্য দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সেভাবে বিনয়প্রকাশ ভক্তদের অন্তর হইতে অভিব্যক্ত ও বিকশিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না, কারণ তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিল না।

বিনয় যাঁহাদের জীবন, যাঁহাদের প্রাণের ধর্ম্ম, তাঁহাদেরই পক্ষে বিনয়প্রকাশ সাজিতে পারে। এই কারণে আমরা যথাযুক্ত বিনয়প্রকাশের পক্ষপাতী হইলেও অতিরিক্ত ও অযথা বিনয়প্রকাশ অনুমোদন করিতে পারি না।

অতিরিক্ত বিনয়প্রকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার আমাদের আরও একটী কারণ আছে। ইহা তো প্রসিদ্ধি আছে যে, একজনকে যদি ক্রমাগত অসাধু বলিতে থাকা যায়, তবে সে ক্রমে অসাধুতারই পথে স্বতই নামিয়া যায়;

একজন অসাধুকে যদি ঘৃণা করিবার পরিবর্ত্তে ক্রমাগত সাধু বলিতে থাকা যায়, তবে সেও নাকি সাধুতার পথে অগ্রসর হয়। প্রবচনগুলি বহুযুগের অভিজ্ঞতার সংহত আকারে অভিব্যক্তি মাত্র। সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, উপরোক্ত চলিত কথার ভিতরেও যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। ঐ কথার উপর দাঁড়াইয়া আমরা বোধ হয় বলিতে পারি যে, অতিরিক্ত অযথা নকল বিনয় প্রকাশ করিতে গিয়া নিজেকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা হেয় প্রচার করিতে করিতে হেয় হইবার অনেক ভাব ও চিন্তা আমাদিগকে নিঃসন্দেহ স্পর্শ করিবে—স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমানে auto-suggestion অথবা আত্মমোহন তো সুপ্রতিষ্ঠিত সত রূপে দাঁড়াইয়াছে। নিজেকে ক্রমাগত হেয় বলিতে বলিতে ঐ আত্মমোহনের ফলেই অনেকটা হেয় হইয়া পাড়তে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না। আজ কিছুকাল হইল, আত্মমোহনের প্রভাব সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প শুনিয়াছিলাম। লর্ড কার্জ্জনের এক বন্ধু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। অপেক্ষাগৃহে বা ante-chamberএ তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কার্জ্জনের পরিচারক বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহার নামপত্র লইয়া প্রভুর নিকট দিতে গেল। ইতিমধ্যে বন্ধু শুনিতেছেন—লর্ড কার্জ্জন চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—I can, I shall, I must,—আমি পারি, আমি করিব, আমি নিশ্চয়ই করিব। বন্ধুর নাম পাইয়া লর্ড কার্জ্জন ভৃত্যকে বন্ধুকে লইয়া আসিবার আদেশ করিলেন। বন্ধু লর্ড কার্জ্জনের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকার চীৎকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি auto-suggestion দ্বারা তাঁহার influenza আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যাক্, মোটের উপর কথা এই যে, অতিবিনয় প্রকাশ করিয়া কাহারও ইহা দেখানো সঙ্গত নহে যে, তিনি জগতের যেখানে যে আছে, সকলের অপেক্ষাও হেয়—সকলের অপেক্ষা তাঁহার আসন নিম্নে; আর অতি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাহারও ইহাও মনে করা সঙ্গত নহে যে, জগতে সকলের অপেক্ষা তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহার আসন সকলের উপরে। কোন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক, অবশ্য উপহাস করিয়া, অপর একজন ধর্ম্মপ্রচারককে বলিয়াছিলেন—দেখুন, যখন বক্তৃতা বা উপদেশ দিবেন, তখন একমাত্র নিজেকেই মানুষ ভাবিবেন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে মেষের দল ভাবিবেন। তিনি অবশ্য উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের অন্তর অতিমাত্র অহঙ্কারে ডুবিয়া থাকে, তাঁহারা সচরাচর সত্যই ঐ প্রকার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন।

নিজেকে ক্রমাগত হেয় মনে করা, মুখে বলা, অন্তরের উচ্চ আশাভরসা, প্রাণের উচ্চ আকাংক্ষা সকলই নির্ব্বাপিত করে, মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করিবার যথেষ্ট সহায়তা করে। অতিবিনয়ী ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। স্বভাবতই নিজেকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পরাংমুখ হয়। অতিবিনয় মনের উপর উগ্র বিষের কাজ করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং, এই কথাটী বোধ হয় সকলেরই জানা আছে।—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা; অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্॥

অতি দর্পের ফলে লঙ্কা গেল; অতি মানের ফলে কৌরবগণ বিনষ্ট হইল; অতি দানের ফলে বলিরাজা বাঁধা পড়িল; অতিমাত্রায় যাহা কিছু তাহা গর্হিত, অর্থাৎ বেশী কিছু করা বা সামঞ্জস্যের অতিরিক্ত করিয়া বাহাদুরী করা কিছু নয়—গুণের বদলে তাহা দোষের কারণ হইয়া পড়ে।

আমরাও এখানে বলিতে চাই, অতিরিক্ত অবিনয় বা দুর্বিনীতভাব যেমন বহু অনিষ্টের কারণ হয়, সেইরূপ অতিরিক্ত অর্থাৎ অযথা বা অসঙ্গত বিনয়প্রকাশও নানা অনিষ্টের কারণ হয়। নিজেকে যদি সমালোচনায় তৌলদণ্ডে ফেলিয়া ওজন করিতে চাও, কর; তাহাতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সেই ওজনের ফলে নিজের যথার্থ মূল্যটুকু বাহির করিতে হইবে। সেই মূল্যটুকু বাহির করিয়া তাহারই উপর সংসারক্ষেত্রে বীরের মত বিচরণ করিতে হইবে। নিজের ভুলভ্রান্তি বা কোন বিষয়ে অক্ষমতার জন্য কখনই নিজের কাছেও নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করিবে না, অপরের কাছে তো হেয় প্রতিপন্ন করা দূরের কথা। ভগবান বিশ্বপতি, জগতসংসারের সকল ঐশ্বর্য্যের আকর; তুমি তাঁহার সন্তান; তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত। তিনি তোমার অন্তরে চির অধিষ্ঠিত। সুতরাং আপনাকে তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান জানিয়া অন্যায় বিনয় প্রকাশ করিবে না—সকলের নিকট যাহাতে উপযুক্ত মানমর্য্যাদা লাভ কর, সংসারে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে যাহাতে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইতে পার, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইবে। ঈশ্বর সহায় হইবেন।

সকল ধর্ম্মেই সত্য, সকল ধর্ম্মই সত্য নহে।

গত ২৬শে কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে "শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা কোন এক প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের নববিধান-শাখার কোন কোন আচার্য্য এই যে মত ব্যক্ত করেন যে, "সকল ধর্ম্মই সত্য", তাহা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। তাহা যদি সত্য হইত তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম প্রধান প্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রয়োজনই হইত না। আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে নববিধানসমাজের কোন নেতার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা সাধারণতঃ প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তে কিছু বিভিন্ন অর্থে ধর্ম্মশব্দের ব্যবহার করেন, এবং সেই অর্থ ধরিয়াই তাঁহারা সচরাচর "সকল ধর্ম্মই সত্য" বলেন। আমরা নিষ্প্রয়োজনে প্রচলিত কোন শব্দের অপ্রচলিত বা মনঃকল্পিত অর্থের ব্যবহার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা সমীচীন বিবেচনা করি না। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক শব্দের এইরূপ ব্যবহারের ফলেই প্রকৃত সত্যধর্ম্মের উপর বিস্তর আগাছা পরগাছা জন্মিয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলে, ভারতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশের উপর দাঁড়াইয়া আমরা ব্রাহ্মসমাজের নববিধানশাখার ভ্রাতৃবর্গকে "সকল ধর্ম্মই সত্য" এই কথা পরিত্যাগ করিয়া "সকল ধর্ম্মেই সত্য" এই কথাই ব্যবহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। ইহার ফলে আমাদের বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজ মিলনের পথে অন্ততঃ কিছুদূর অগ্রসর হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের সকল কর্ম্মে, সকল ভাবে ও চিন্তায় মিলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা নিম্নে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ সহ উপরোক্ত "শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন" প্রবন্ধের অনেক অংশই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্রের ক্রন্দন।

(কেশবচন্দ্র) পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বরের শত্রুতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :—"হরির দুষমন যারা, তাদের যদি আদর করি, তাহলে উপাসনার ঘরে আসিয়া দেখিব, দরজা বন্ধ। শত্রুকে যদি প্রশ্রয় দি, হরিকে আর পাওয়া যাইবে না। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র লোপ হয়। একব্যাটি ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক দিলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়।"

এই বলিয়া তিনি দুর্গোৎসব উপলক্ষে কাঁদিয়া বলিলেন, "দেখ মা, আজ লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না কাহাকে লইয়া আসিল? মৃত মৃত্তিকা, তাকে আনিয়া 'মা মা' রবে ডাকছে। আহা, দুঃখ হয়! মাটী, কাঠ, খড় এ সব মা হয়ে বঙ্গবাসীর প্রাণমন আকর্ষণ করিতেছে। পুতুল, তুই কেন মার জায়গা নিলি? রংকরা পুতুল, তুই সামান্য মাটী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডপতির আসন নিলি? যারা দেশের পিতামাতা, শাস্ত্রকার, চিকিৎসক, তারা কি এই উপায় করে গেল যে, বৎসরান্তে যত পাপ হবে, একটা মাটীর পুতুল হইয়া সব পাপ দূর করিবে? মাটীর দুর্গা! দেশটা ঘুমাইতেছে নাকি? ঘোর বিকার, বাঙ্গালীগুলো চীৎকার কচ্ছে। খড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এই আমার পরিত্রাণ। বঙ্গদেশ, সোণার দেশ, যায় আর কি। মা, সোণার দেশকে বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি। পৌত্তলিকতা রোগ বড় ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ি মা, এস।"

আবার অন্যত্র তিনি ঈশ্বরের নিকট কাঁদিয়া বলিলেন "হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা! কোথায় মা দুর্গা? একটা কল্পিত দুর্গা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা পাপ অত্যাচার করিতেছে। এক পৌত্তলিকতার ভ্রমে দেশ গেল। আচ্ছা, তাই যেন মানিলাম যে, লোকে বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটির ভিতর পূজা করিতেছে; কিন্তু ওদিকে পূজার বাজনা, এদিকে বো—র শব্দ! দয়াময়, কিসের জন্য কাঁদিব? ভ্রমবশতঃ মাটীপূজা করিতেছে সেজন্য, না জেনে শুনে তোমার নামে পাপ করিতেছে সেজন্য? কোথায় গেল যোগীদের যোগসাধন, হোম, আর্য্যদের স্তবপূজা? সে সব গিয়ে আজ মাটীপূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার! একি ধর্ম্ম? অর্দ্ধেক নাস্তিকতা, অর্দ্ধেক মাটীপূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপ মিশে গেল। আর কি বাকি রহিল! কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল!"

তাই তিনি আরো কাঁদিলেন, "আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া এদেশ হাসিতেছে, আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদছে। বুক চিরে দেখাচ্ছে কত দুঃখ। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্ছে। সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। দেশশুদ্ধ লোক মেতেছে, কিসের জন্য? পুতুলকে দেবতা মনে করে। এ পূজা দেখাচ্ছে, আমরা কত নীচ হতে পারি। এর চেয়ে নীচ আর কি হবে? খড়ের পর্য্যন্ত পূজা হলো! যাঁরা এক সময় হিমালয়ে

তোমার ধ্যানধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে নিম্ন-ভূমিতে এসে তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্ছেন! পণ্ডিতেরা এই মাটীর সম্মুখে শ্লোক উচ্চারণ কচ্ছেন।"

"আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে, সেগুলো যেন রেখে দি। আমাদের কাছে সব নিরাকার। আমাদের মা, দয়া কর, মাটীপূজা দূর কর, ভাল জিনিষগুলি রক্ষা কর। এই যে এসময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি দেখায়, এটি যেন থাকে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় দর্শন করায়, তা যেন থাকে। এই যে বৎসরান্তে পিতা-পুত্র স্বামীস্ত্রীর যে পবিত্র মিলন, তা যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী, এই যে আদর্শ পরিবার যেন থাকে। মা, ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, এখনকার নব্য স্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁদের হাতে। এদেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। যা এর ভিতর খারাপ আছে, দূর কর; কালরাত্রি পোহাইল। দয়াময়ি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে গ্রহণ করিয়া, আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি।"

(নববিধান) সর্ব্বধর্ম্মের অসার ভাগ, মানবীয় মনঃকল্পিত ভাগ যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সার অংশ, সত্য অংশ, যাহা প্রকৃত বিধাতার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাংশ, তাহা ব্রহ্ম-প্রেরণায় দিব্য জ্ঞানে দর্শন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ তাই পৌত্তলিক ধর্ম্মের মধ্যেও যাহা অধ্যাত্ম সত্য, তাহা উদ্ধার করিয়া, তাহার খোসা যাহা তাহা পরিত্যাগ করিলেন ও তাহাই করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

উক্ত প্রবন্ধের লেখক নববিধানের নামে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে অসার বাদ দিয়া সার সত্যধর্ম্মসংগ্রহে কর্ত্তব্যতাবিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা ও উক্ত কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র কম বলেন না। কিন্তু সত্য ধর্ম্মের খাঁটি আদর্শ ঠিক রাখিবার জন্য প্রচলিত মূর্ত্তিপূজাসমূহ উপলক্ষে ব্যবহৃত দেবদেবীর নাম ও পূজাবিধি প্রভৃতি তাঁহাদের উপাসনায় কোন প্রকার স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে এই কারণেই উপাসনায় প্রচলিত দেবদেবীর নাম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের ঐ অপর দুই শাখা রামমোহন রায়ের ঐ নিষেধবিধি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই নববিধান-সমাজও রাজা রামমোহন রায়ের ঐ নিষেধবিধি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়াই উপলব্ধি করিবেন।

THE BRAHMA SAMAJ OF INDIA

UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(3)

36. The *National Paper.*

On the loss of the *Indian Mirror*, which was of course immediately utilised for purposes of invective and attack, the *National Paper* was started for justifiable defence. So keen and true were the shafts it strung, that roused and excited seceding Brahmas convened a general meeting at the Sealdah station to discuss the matter, and Keshub Chunder delivered a spirited address to a large number of people.

37. Keshub's letter to Devendranath dated the 19th Ashar, 1787 *Saka.* (2nd July 1865 A.D.)*

It was finally agreed by Keshub Chunder and his friends to send the following letter to Devendranath Thakur, which we insert below with that gentleman's reply :—

TO THE REVERED DEVENDRANATH THAKUR,

Trustee and Principal Minister of the

Calcutta Brahma Samaj.

Sir,—With due reverence we beg to represent that it is with feelings of joy and triumph that the Brahmas behold the progress which the *Samaj* has been making for some years past, and which has led many to be more attached to that religion, with a conviction of its being a manifestation of Divine Mercy and the Majesty of

* The English date (19th June 1864 A.D.) given in the book seems to be a mistake. The English date corresponding to the Bengali date of the letter should be 2nd July 1865 A. D. *Ed. T. P.*

Truth. We have full and vivid instances of its progress on every side. The truth of Brahmaism has been spreading to every quarter whether young or old, man or woman, rich or poor, learned or unlearned, all are continually repairing to its asylum. The numbers of Brahmas are increasing as much as the branches of the *Samaj* are being established on all sides. It is increasing in depth as it is extending in length and breadth. As it is stretching far and wide to bind all human hearts in one universal faith, so it is taking a deep root in the lives of men. Whether, as relates to the advancement of divine knowledge or expansion of divine love; whether as regards the purification of the heart or social reform; whether as concerns the preaching of the religion or proselytism of the people, there is a marked progress in everything all around us.

But we need not give a lengthy description of these things to you, who, for a space of about thirty years, have been with unflagging zeal and energy, labouring for the success of the *Samaj*, and cannot but feel delighted, we believe, at the present progress of our cause, when you have so many times gladly told us that we have succeeded even beyond your expectations. It is this current of progress which has given rise to the present dissension. Many young Brahmas are dissatisfied with the old mode of conducting proceedings observed in the *Samaj*, and this dissatisfaction has become the root of the present discord. Though this discord is much to be regretted, yet it is not a thing to be wondered at. Such disputes are generally known to take place whenever a change or reform is introduced, and whenever old and new doctrines come into collision with each other. Their mutual struggles to gain the upper hand is always productive of much dispute, debate and discussion, though at the end truth must prevail, and all peace and bliss are sure to be restored by the mercy of God. The apathy and discontent which many are now found to bear against the *Brahma Samaj* tend only to corroborate this truth. With the advancement of knowledge, many have now come to believe in the independence, the catholicity and progressiveness of Brahmaism; and that it is quite opposed to idolatrous and sectarial faiths, and to all kinds of social and domestic evils. Impressed with this belief, the educated young party, finding the rules and forms of the *Samaj* to be of a limited and sectarian kind, and subversive of all improvement and progress, have become unwilling to keep further connection with it, and have become eager to adopt better forms and rules. The present discord is not owing to any dispute regarding any earthly property, or to any earthly interest or enmity of any kind, but a pure disinterested contest for the advancement of religion.

It is a dispute between the exalted ideal of religion in the hearts of the young Brahmas, and the state of the old *Samaj*. It is for this reason quite necessary to introduce some changes, which the *Samaj* would do well to adopt. It will not be possible for the *Samaj* to effect the great purpose it has in view, *i. e.*, the regeneration of the people, unless it keeps pace with the exalted sentiments of the times; unless it changes the mode of its action agreeably to the new ideas and new wants of the community, and suit its course to the spirit of the pushing and progressive class of its members. The *Samaj* ought to progress according to the progressive spirit of its religion.

Believing such reformation to be necessary, we beg to submit the following propositions to your liberal consideration, and hope you will do what you think right and proper :—

1st.—That no minister, or preacher, or reciter of the *Samaj*, should retain any mark of caste or sectarian distinction whatever.

2nd.—That honest, pious and learned Brahmas only be allowed to occupy seats on the Vedi.

3rd.—That the hymns, expositions and sermons should be fraught with the liberal sentiments of Brahmaism. No expression of disapprobation or vituperation must be used in them against any sect or religion; they should express a fellow-feeling with all of them.

Should you feel disinclined to adopt the aforesaid suggestions of change in the Divine Service of the *Samaj*, you will oblige the generality of Brahmas by appointing some other day for our public worship in the *Samaj* in the said form.

This compliance on your part will doubtless settle the present dispute, and re-establish union among the Brahmas in place of the discord which has now arisen among them. Should you feel unwilling also to comply with this request, you will oblige us by giving your best advice for our establishing a separate *Brahma Samaj* for ourselves.

Yours most obediently,

(Signed.) Keshub Chunder Sen.
Umanath Gupta.
Mahendranath Bose.
Jadunath Chakrabarti.
NibaranChunder Mukhopadhyaya
Pratap Chunder Majumdar.

Calcutta, 19th Ashar, 1787 Saka.
(2nd July 1865).

38. Devendranath's reply.

To the above, Devendranath replied as follows :—

Beloved Keshub Chunder Sen, Umanath Gupta &c. &c.

With regard is the following addressed :—

I received your address of 19th Ashar, and became acquainted with your wishes and request. Your dissatisfaction with the present mode in which the proceedings of the *Brahma Samaj* are conducted, and intention of establishing a new mode, is a sign of the progress of the *Brahma Samaj*.

I well know that it is not with the *Brahma Samaj* alone, but with every kind of human institution, that no mode of procedure can for a long time remain stationary, and a firm resolution for preserving its old character is repugnant to the laws of society. Human condition changes according to the tenor of the time, and new institutes are substituted instead of old ones, without which every progress must cease in its course. The *Brahma Samaj* has never failed to adopt this law (of renovation). Whenever it was thought necessary to change an old rule, it has been done as far as it was deemed practicable, and the same principle still continues in force, and is punctually observed at all times.

2. It is no wonder that many should believe Brahmism as quite repugnant to idolatry, sectarianism, and social and domestic evils of every kind. Without such a belief no one can realize the object with which he embraced it. Impressed with this belief, most of the young educated men are led to consider the present rules, the service and the forms of the *Samaj*, as exponents of a limited and sectarian faith, and suppressive of improvements, obliging them to give up their connection with it and to follow a better course. It is for this purpose that you have with one accord proposed to me three articles of improvement, which I was glad to take into my mature consideration.

3. Your first proposition states, "that no minister, sub-minister or reciter of the *Samaj* is to wear any sign on his person distinctive of caste or sect." I do not suppose that you intend to mean the titles of men (such as Mookerjea, Banerjea, &c.,) which are expressive of caste distinctions by the word *sign* which you have used. You simply seem to mean by the term the Brahminical thread which serves as an exponent of the Brahmin class. I cannot for several reasons give my consent to your proposals at present, and the reasons why I dissent are stated as follows :

4. Long before the introduction of *anushthanas* or Brahmic domestic rites, divine service was the only ceremony performed at the *Samaj*. Those who then had the faith and courage to join the *Samaj* and attend divine service only had to undergo every kind of better persecution, like the practisers of the said Brahmic rites at this time. The introduction of a reformed ritual into the *Brahma Samaj*, and the accession of Brahmas with such exalted sentiments and views as yourselves have been the fruits of *their* patience, agitation and zeal. You also, when you first joined the *Samaj*, had no other object in view than to perform divine worship only, and it is very likely that there are some men

among you who cannot join in any thing else but that worship. There are many both among the old as well as new parties, who have not yet been able to observe *anusthan*, and yet neither they nor you are objects of my disregard. What I wish is simply this, that both you as well as they, being on friendly terms with each other, may effect the improvement of the *Brahma Samaj* that your strength combined with theirs may sustain the institution; and that your examples may infuse strength and encouragement to them. But if you come to disagree with each other, it will be to the disadvantage of both parties; you will lose in strength as they in courage and progress. Both these occurrences are as painful to me as they are detrimental to the interests of the *Samaj*, and it is my implicit duty to prevent the adoption measures which will cause such occurrences. The adoption of your very first proposition will not, I am sure, fail to be attended with this unhappy consequence. Again, on the other hand, I have to apprehend that, unless I were to concede to your proposals, you also will alienate yourselves from the *Samaj*, and bring on the same evil I want to avert. Yet I think it will savour of a great partiality on my part if I should be disposed to slight them by conceding to your terms. For how is it possible for me to deprive men of those privileges, which they still retain by their conformity and strict obedience to those rules by which they have come to, and have kept possession of, them up to this time? Should the largeness of your souls enable you patiently to bear with the authority they have acquired in the *Samaj*, and to act in co-operation with them with loving hearts and minds, as with your elder brothers, you will no doubt in that case be able to effect far greater progress in the cause of Brahmaism than in the manner you have already proposed. If you act in the way I advise you will find them more favourable to the reforms you want to introduce than if you act in the way you propose. There is no difference between you and them, in the ends and objects you have both in view which is the well-being of the *Samaj*, but about the manner and means of bringing them into execution.

5. It is but superfluous to notice your second and third proposals, because both of them, as far as I am aware, are always observed in actual practice in the *Samaj*, as much as possible according to the light possessed by the members.

6. You have represented in the next place that if I should disagree with you in adopting the new modes of service recommended by you, you will feel obliged by my appointing a certain day of the week for the performance of divine worship by "the generality of Brahmas," in the *Samaj* according to your new form. By this it appears that you have designated the few Brahmas who are dissatisfiied with the present state of the *Samaj*, by the title of "the generality of Brahmas," but there are Brahmas greater in number than those who have joined with you, they as well as you are known by the appellation of "the generality of Brahmas." If you should mean all Brahmas by this term, and ask for all the appointment of another day in the week for offering their prayers in the *Samaj*, such a request is altogether unnecessary, because the days already appointed for divine worship in the *Samaj*, are for the generality of Brahmas and not only for Brahmas but the public in general. The generality of Brahmas grace the hall of worship with their presence on those days and testify the joy of their minds at the same.

7. But if you should request another day for *your* worship alone in the *Samaj*, I am really sorry I cannot comply with this request also. You say that "this will be good for both parties, and introduce harmony in the place of the discord now reigning in the *Samaj*." But I can clearly foresee that this will be a source of greater discord in the *Samaj*, which is highly improper in a place of public worship. I had once before made a rule that some of you should conduct divine service on the first Wednesday of every month, in which case you would have been enabled, without requiring another day for your special

worship, to lay down the foundation of an improvement without any detriment. Divine service was once conducted according to this rule, and we waited for you on several other occasions. But to my great disappointment you declined to attend; and now I see no way of union unless you join together in your worship as before.

8. At the end it appears that, unless I consent to any of your terms, you will etablish a separate *Samaj*, for which you have asked my advice. I say the more *Samajes* are established at different places for the worship of the One Only God, the more good is it calculated to confer on mankind. Relying on the instruction of the great Ram Mohan Roy, the founder of Brahmaism, I sincerely give you this advice that you should make use of such sermons, expositions, prayers, and hymns, at your Divine Service in the said *Samaj*, which are best calculated to exalt the intellect, heart, soul, and mind towards God, and which help to infuse Divine love, purity piety, and holy sentiments into the heart and mind.

9. Being prevented by the aforesaid reasons to give my consent to your request, I beg you will not be displeased with me. So peace and prosperity wait on you and God always manifest himself to you.

Your sincere well wisher,

DEVENDRANATH SARMA.

Calcutta,
23rd Ashar, 1787 Saka,
(6th July, 1865).*

নানাকথা।

হিন্দুমিশনের সাফল্য।—আমরা কার্ত্তিক মাসের হিন্দুমিশন পত্রে হিন্দুমিশনের সাফল্য পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে দেখাই আমাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু ভগবানের মঙ্গল বিধানে যেরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তৃণ-বৃক্ষাদির জন্ম ও বৃদ্ধি দেখা যায়, সেইরূপ বিভিন্ন মানবসমাজেও বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা বা culture এর উদ্ভব ও স্থায়িত্ব লাভ হয়। এই ভারতবর্ষে যে শিক্ষাদীক্ষা জন্মলাভ করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাকে ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রূপ দান করা বড়ই কঠিন; কিন্তু তাহাকে সাধারণত হিন্দু শিক্ষাদীক্ষা বা হিন্দু culture বলিলে তাহার ভাব আমাদের অনেকটা হৃদ্গত হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে এই হিন্দু culture এর স্থান অনেক উচ্চে। সেই কারণে আমরা এই হিন্দু culture এর ক্রমাগত প্রসার ও গভীরতা দেখিতে পাইলে খুবই সুখী হইব। এই প্রসার ও গভীরতা লাভের পক্ষে সমভাবের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি একটা বড় রকমের সহায়। এই কারণে শুদ্ধির সাহায্যে বা অন্য উপায়ে হিন্দুভাবের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা আমরা খুবই অনুমোদন করি। উপরোক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখি যে এবারকার লোকগণনায় বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ১৭॥০ লক্ষ বৃদ্ধির মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে ৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার জন্য আমরা হিন্দুমিশনকে অভিনন্দন করিতেছি। আমরা ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমাদের এই আনন্দের মূলে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবের নামগন্ধ নাই।

প্রত্যেক লোকের বাগান করা :—সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখি যে, সুপ্রসিদ্ধ হেন্‌রি ফোর্ড আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কারখানার বিবাহিত কর্ম্মচারীকে নিজ নিজ জমি চাষ আবাদ করিয়া যথাশক্তি শস্যাদি উৎপাদন করিতে হইবে, যাহাতে কর্ম্মচারীগণের প্রত্যেকে আগামী শীতকালের মধ্যে ঐ উৎপন্ন শস্যাদি হইতেই নিজ নিজ পরিবারের ভরণপোষণ চালাইতে পারে। এই আদেশ এমন কঠোর যে, যাহারা শাকসব্জি প্রভৃতি শস্যাদি উৎপাদন করিতে না পারিবে, তাহাদিগকে ফোর্ডের কারখানা হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

ফোর্ডের উদ্দেশ্য যে, এরূপ আদেশের পরিণামে দেশের বেকারসমস্যার একটা সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বিগত মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে জার্ম্মানীর চাষআবাদ-বিষয়ক ব্যবস্থা সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম যে, সে দেশে জমী পতিত রাখার বিরুদ্ধে এমনই কড়া নিয়ম জারী ছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার ধারে এতটুকু জমী নিষ্ফলরূপে পড়িয়া থাকিলে মিউনিসিপ্যালিটীকেও তজ্জন্য জরিমানা দিতে হইত। এইরূপ ব্যবস্থার ফলেই নাকি যুদ্ধের সময়ে যখন জার্ম্মানী চারিদিক হইতে অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতিপদে তাহার আহার্য্য দ্রব্য আমদানি হওয়া বন্ধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, তখনও জার্ম্মানী অন্তত আহার্য্য দ্রব্যবিষয়ে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল; যুদ্ধের

---

* *Vide* Footnote in page 199 above.
—*Ed. T. P.*

চার-চারটী বৎসর আহার্য্য-দ্রব্যের জন্য জার্ম্মানীকে কাহারও নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইতে হয় নাই, বরঞ্চ জার্ম্মানী দেশবাসীর আহার যোগাইয়া উদ্বৃত্ত হইতে তাহার মিত্রসংঘকেও আহার যোগাইতে পারিয়াছিল। আর আমাদের দেশে কত কত জমী "সুফলার" পরিবর্ত্তে "নিষ্ফলা" থাকিয়া যেন শ্মশানের মৃত্যুহাসি হাসিতেছে। এখন বুঝিতেছি, আমাদের বাল্যকালে কি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পিতৃদেব আমাদের বাটীর সংলগ্ন ভূমিখণ্ড চাষ-আবাদ করিয়া বাগান করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক ভারতবাসী নিজ নিজ অধিকারস্থ জমীর চাষ আবাদের সুবন্দোবস্ত করিয়া আহার্য্যের ব্যবস্থা করিলেই দেশের কল্যাণ হইবে। নতুবা "পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"।

ভারতে যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাণ—ঠিক এক বৎসর হইল, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে ডাঃ সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি একটী কথা বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে উন্নতির পথে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে, বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি আবশ্যক সেই সকল যন্ত্রপাতি বিষয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া তোলা দরকার। এই কথাটী একটা খুবই বড় সত্য বলিয়া আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। আমরা কিন্তু দেখি ভারতবাসী যে তিমিরে সেই তিমিরে। এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা শুনি নাই যে, ভারতে কলকারখানা যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য কোন বড় বা ছোট কারখানা খোলা হইয়াছে। আমরা অবশ্য দেখিয়া সুখী হইতেছি যে, "কেমিক্যাল ওয়ার্কস" নাম দিয়া বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক কারখানা ভারতের বিভিন্ন দিকে খোলা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি বিদেশীয়গণ সহসা ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি আমদানী বন্ধ করিয়া দেন, তবে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইবে কি প্রকারে? তখন তো বিদেশের নিকটে দয়ার জন্য ভিক্ষা-পাত্র লইয়া দাঁড়াইতে হইবে অথবা ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা বন্ধ করিতে হইবে। আমি ব্যবসায়ে মার্কিণদিগের কৃতকার্য্যতার কারণ বিষয়ক একখানি পুস্তকে দেখিয়াছিলাম যে, তাহাতে ব্যবসায়ীগণের নিজ নিজ ব্যবসায়ের মূল ধরাকে কৃতকার্য্যতার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কথাটা খুবই ঠিক। আমরা যদি ছাপাখানার ব্যবসায়ে নামি, তবে উহার কৃতকার্য্যতার জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, যথা ছাপার কালি, কাগজ প্রভৃতি, আমাদিগের কর্ত্তব্য হইবে ছাপাখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করা এবং যথাসাধ্য মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুতেরও চেষ্টা করা। ব্যবসায়ীদের কৃতকার্য্যতার কারণ ও উপায় সম্বন্ধে আমি ভারতবাসী-দের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে এই ইঙ্গিত অবলম্বনে তাঁহারা বিবিধ উদ্যমে ভগবানের কৃপায় সফলকাম হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দিনের পর দিন বঙ্গবাসী শিক্ষিত জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। গত ২৮শে কার্ত্তিকের "হিন্দু" পত্রে 'প্রাচ্য ভূখণ্ডে নারীর সম্মান' প্রবন্ধ এবং ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের "হিন্দু" পত্রে 'বিদেহ আত্মার সহিত কথোপকথন সম্ভব কি না' ও ২৮শে কার্ত্তিক তারিখের "সময়" পত্রে 'দুর্গা অর্থে দুর্গতি-নাশিনী' প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। সকল বিষয়ে বিশেষত বর্ত্তমান যুগে দুর্নীতি-দমনে সফলতা লাভ করিতে হইলে সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র প্রভৃতির যথাসম্ভব সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট—আমরা গত ৫।১১।৩১ তারিখের এডভান্স কাগজে দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই শিক্ষায়তন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত এস, কে, দত্ত জার্ম্মাণীতে গিয়া মিউনিক সহরের জলসরবরাহের কারখানায় এবং বার্লিন সহরে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের অধীনে কার্য্য করিয়া সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন। এই দুই কারখানার এক এক বিভাগে তিনি সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষায়তন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিদেশে এরূপ উচ্চ কর্ম্ম পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ-বিধান করা ভারতবাসীর পক্ষে বোধ হয় এই প্রথম। উক্ত শিক্ষায়তনের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চাঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার পথ এদেশে এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। পূর্ব্বে রুড়কী কলেজে ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আজ অনেক বৎসর হইল তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া জানি। যাদবপুরের শিক্ষায়তনকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভি-নন্দন করিতেছি। এই শিক্ষায়তনের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি।

বেজুড়ার বীর ৺বৈদ্যনাথ মজুমদার।

(শ্রীচারুবালা দেবী গুপ্তজায়া)

[শ্রীচারুবালা গুপ্তজায়া তাঁহার স্বদেশস্থ এক বীর-পুরুষের বিবরণ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে এক প্রসঙ্গে আমরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে এমন অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইলে সেই সেই গ্রাম ধন্য হইবে এবং বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইবে। আমরা এই উদ্দেশ্যে লেখিকার প্রেরিত প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য গ্রামের এইরূপ ইতিহাস যদি প্রাপ্ত হই, তবে তবে তাহাও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ভং সং]

কাশ্যপগোত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ মজুমদারবংশের এক শাখা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে, দ্বিতীয় শাখা ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী বনগ্রাম গড়িহাটা ও সেরপুর গ্রামে, এবং তৃতীয় শাখা শ্রীহট্ট জেলান্তঃপাতী বেজুড়া, আঙ্গিউড়া, বরগ, ইটাখোলা ও সুরমা গ্রামে অবস্থিত আছে। ময়মনসিংহের শাখার চৌধুরী উপাধি এবং বর্দ্ধমান ও শ্রীহট্টের শাখাদ্বয়ের মজুমদার উপাধি। ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামের স্বনাম-বিখ্যাত ব্যারিষ্টারপ্রবর পরলোকগত আনন্দমোহন বসু মহাশয় আঙ্গিউড়ানিবাসী পেন্‌সনপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত মথুর চন্দ্র মজুমদার বি-এ, মহোদয়ের পিতৃব্যশ্রীয়।

উক্ত মজুমদার-বংশ ভারতে মুসলমানশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পুর্ব্ব হইতে সন্তানপরম্পরায় ভূম্যধিকারী-স্বরূপে প্রজাশাসন ও সংরক্ষণপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। জনশ্রুতি এই যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজা ভগদত্ত উল্লিখিত মজুমদারবংশের আদি পুরুষ। বহু অনুসন্ধান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত উক্ত জন-শ্রুতির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

৺বৈদ্যনাথ মজুমদার মহাশয় মুসলমানরাজত্বের অবসান ও ইংরাজরাজত্বের উদয়ের সন্ধিক্ষণে বেজুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে সমগ্র কলাপ ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং একাদশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াই লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তাঁহার শরীরে সমধিক বল ছিল। পাঁচ জন লোক যে প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিতে পারিত না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন।

রঘুনন্দন পর্ব্বত হইতে বনাহস্তী মধ্যে মধ্যে বেজুড়াতে আসিয়া উপদ্রব করিত। বৈদ্যনাথ এক দিবস একটি বনা হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া উহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, এবং এই সুযোগে গ্রামের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়া উহাকে বধ করিল। তিনি এক দিবস দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পশ্চাতে অনতিদূরে একটি বন্য মহিষ শৃঙ্গ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। তিনি লম্ফ দিয়া গিয়া উক্ত মহিষের শৃঙ্গদ্বয় দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করিলেন, এবং মহিষের নাসিকাতে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার পদাঘাতে মহিষের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

খাঁটুরা গ্রামনিবাসী সুরালী নামক এক যবনদস্যু ছিল। সে দিনেই দস্যুতা করিত। সে সদলবলে রাজপথে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর পথিককে মারিয়া ধরিয়া বধ করিয়া সমস্ত লুণ্ঠন করিত। তাহার দৌরাত্ম্যে এত-দঞ্চলের লোকেরা রঘুনন্দন পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তে ও স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চলিয়া যাইতে লাগিল। এতদঞ্চল প্রায় উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া উক্ত বীর-কেশরী বৈদ্যনাথ যবনদস্যু সুরালীর বংশ ধ্বংস করতঃ দশে শান্তি সংস্থাপন করিলেন। তদবধি এই অঞ্চলে আর দস্যুতা হয় না। এতদঞ্চলের লোকেরা পরম শান্তির সহিত জীবনযাপন করিতেছে। এতদঞ্চলের মুসলমানেরা তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সন্তানপরম্পরায় মজুমদারবংশের অনুগত হইয়া আছে।

উক্ত বীরকেশরী মজুমদার তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে প্রজাদিগের পানীয়জলের জন্য একএকটি পুষ্করিণী ও প্রত্যেক গোচর মাঠে গবাদি পশুর পেয়-জলের নিমিত্ত একএকটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। ঐ সমস্ত পুষ্করিণী 'মজুমদারের তালাও' নামে অদ্যাপি তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার জমি-দারীর পশ্চিমসীমা সরাইল পরগণা, পূর্ব্বসীমা তরপ পরগণা, উত্তরসীমা উজাইল পরগণা এবং দক্ষিণসীমা স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা জেলা। তাঁহার এই বিপুল ভূসম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

বীরকেশরী বৈদ্যনাথ কেবল যে শারীরিক বলে বলীয়ান ছিলেন, এমন নহে, তাঁহার অসাধারণ মানসিক বলও ছিল। তিনি একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রায় তিন ঘণ্টা কাল স্বকীয় ধারপণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিতেন। তিনি প্রজাপালনতৎপর ছিলেন। দুর্জ্জনের শাসন ও সজ্জনের সংরক্ষণ তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কার্য্যে নিয়মিত রাহতেন। তিনি দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি সত্যভাষী ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন।

উক্ত মজুমদার মহাশয় পাটুলী ও বুল্লা নামক দুইখানি গ্রাম তাঁহার কুলপুরোহিতকে দান করিয়াছিলেন। এই পুরোহিতবংশ অদ্যাপি মজুমদারবংশের পৌরোহিত্যের জন্য উক্ত গ্রাম দুইখানা ভোগদখল করিতেছেন। তিনি দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি এতদঞ্চলের হিন্দুমুসলমান উভয় সমাজের সমুদয় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বহু ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেজুড়াতে পাঁচটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নানাদেশীয় ছাত্রেরা সেখানে আসিয়া সাহিত্যব্যাকরণ, কাব্যঅলঙ্কার, স্মৃতিশ্রুতি, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতেন। তিনি অধ্যাপকদিগকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন। সংস্কৃত আলোচনার জন্য এতদঞ্চলের লোকেরা বেজুড়াকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া সম্মান করিত।

বীরকেশরী প্রিয়দর্শন ও উদারচরিত্র ছিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ, সবল ও নীরোগ ছিল। তিনি ব্রহ্মমূহুর্ত্তে নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রত্যহ বহুদূর ভ্রমণ করিয়া মুক্তবায়ু সেবন করিতেন। তিনি দেড়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একদিনও রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পান নাই।

বৈদ্যনাথ দরিদ্রনারায়ণকে মুক্তহস্তে দান করিতেন, তিনি প্রত্যহ অতিথি-সেবা করাইয়া নিজে আহার করিতেন, তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে দরিদ্র নরনারীকে শীতবস্ত্র প্রদান করিতেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, তেজস্বী ও কর্ম্মযোগী ছিলেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে ধান্যভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজাবৃন্দের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ঐ সমস্ত ভাণ্ডার হইতে ধান্য প্রদান করিতেন।

বৈদ্যনাথ সর্ব্ববিষয়ে সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়ে বৈষম্য ছিল না। তিনি বলিতেন, "পরমেশ্বর আমার আদর্শ; তিনি যখন সমদর্শী, তখন আমিও সমদর্শী। তিনি সর্ব্বপদার্থে সমভাবে অবস্থিত আছেন, সুতরাং সমস্ত পদার্থ সমান। সর্ব্ব পদার্থকে সমানভাবে প্রীতি করাই আমার ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য। এক পদার্থের প্রতি প্রীতি এবং অন্য পদার্থের প্রতি অপ্রীতি করিলে একই পরমেশ্বরের এক অংশের প্রতি প্রীতি এবং অন্য অংশের প্রতি অপ্রীতি করা হয়। ইহা মহাপাপ। সর্ব্ব পদার্থকে সমভাবে প্রীতি করাই পুণ্যকর্ম্ম। ফলতঃ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের প্রতি প্রীতিভক্তি করিয়া হিতসাধন করাই ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরের আরাধনা হয়।"

চিঠিপত্র।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। সে সমস্ত পত্র তাঁহার কন্যা লীলাবতী মিত্র মহাশয়ার নিকট ছিল। ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার অনেকগুলি পাঠ করিবার জন্য লইয়া গিয়া মহর্ষির আত্মচরিতের শেষাংশে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি কয়েক খানা চিঠি লীলাবতী মিত্র মহাশয়ার বাক্সের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহার একখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

* * *

বাঁকিপুর, ৭ই পৌষ, ৫৪ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার,

সারদা আমার ঘরের ছেলের মত ছিলেন। তাঁহার সকলের প্রতিই অমায়িক ব্যবহার ছিল। তিনি সকলকেই উপযুক্ত মত সম্মান ও সমাদর করিতেন, বিশেষতঃ আমার সকল কার্য্যেই তাঁহার তৎপরতা, উদ্যোগ ও উদ্যম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম। তিনি উন্মুখ হইয়া থাকিতেন, তাঁহাকে আমি কোন্ কার্য্যে কখন্ প্রেরণা করি, এবং তাঁহাকে আমার কোন অভীষ্ট কার্য্য করিতে বলিলে তিনি নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে ধাবিত হইতেন। আমার মনে হয় না যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—পরলোকে আমার জন্য কোন স্থান সজ্জীভূত করিতে যেন তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

২৪ অগ্রহায়ণে ৮টা রাত্রিতে রবির বিবাহ হয় এবং সেই ২৪ অগ্রহায়ণে ৮॥০ রাত্রির সময়ে সিলাইদহের কুঠীতে সারদার মৃত্যু হয়। সংসারে হর্ষ-শোক সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদিরা এই সংসারের হর্ষ-শোক উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি।"

তোমার একটি গভীর উক্তি আমার মনকে অমৃতাভিষিক্ত করিয়াছে—The impious of my own religion are not my friends but the pious of all relegions are.

তোমাকে আর একটি শুভ সংবাদ দিতেছি যে, এই শরীরের সঙ্গে আমার আত্মার সম্বন্ধ দিন দিন ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতেছে। কি আনন্দ! রোগের আয়তন জরা-শোকে আকীর্ণ এই শরীর আমাকে আর ক্লেশ দিতে পারিবে না। Bodily wants and necessities are so various and engross so much of our attention that they often prove a clog to the soul in the path of spiritual advancement—কি ঠিক কথা, এ কি ঠিক কথা! তোমার এ অমূল্য কথা এ সময়ে আমার বড়ই আদরণীয়।

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণঃ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।

পুনশ্চ—বয়সি সাহেব আবার টাকা টাকা করিতে-

ছেন, এবার আদিসমাজ হইতে তাঁহাকে কি দেওয়া যাইবে তাহার উপদেশ আমাকে দিবে। ইহার উত্তর বোলপুরের শান্তিনিকেতন ঠিকানাতে দিবে।

সঞ্জীবনী, ৩রা বৈশাখ ১৩৩৮।

বঙ্গভাষা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "শরৎচন্দ্র" শীর্ষক নিবন্ধে প্রথম দিকে এই মর্ম্মে লেখা আছে যে, আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব বঙ্গদর্শনে। এর পূর্ব্বে বাঙ্গালী আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। আমা মনে হয় কথাটি ঐতিহাসিক বিচারসহ নহে। বঙ্গদর্শনের বহুপূর্ব্বেই যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকায় আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার আবির্ভা হইয়াছিল, তাহা যে-কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুরাত সংখ্যাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্র নাথও একসময়ে এই তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন।

আধুনিক ভাষা বলিতে রবীন্দ্রনাথ যদি কথিত ভা বুঝিয়া থাকেন তবে তাহাও 'আলালের ঘরে দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ব্যবহৃ হইয়াছিল এবং ঐ সকল গ্রন্থের যে বঙ্গসাহিত্যে নীতিম স্থান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

সংবাদ।

শ্রীললিতমোহন দাস।—আমরা গভীর দুঃখে সহিত অবগত হইলাম যে, সাধারণব্রাহ্মসমাজের অন্যত প্রচারক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় আ কয়েক মাস যাবত কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হই আছেন। কিছুকাল হইল তিনি রাজবন্দী হইয়া কয়ে মাস কারাবাস ভোগ করিয়াছিলেন। বলিতে গে মুক্তিলাভের পর অবধি তাঁহার রোগের সূত্রপাত হইয়াছে আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ভগবান তাঁহাকে শীঘ্র নিরাময় করুন এবং তাঁহাকে সুস্থ ও সবল করি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় দীর্ঘকাল নিযুক্ত রাখুন।

শোকসংবাদ।

৺কুমারকৃষ্ণ দত্ত।—গত ১৫ই কার্ত্তিক রবিবা দ্বিপ্রহরে হাটখোলার দত্ত-পরিবারের প্রসিদ্ধনামা কুমা কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় তাঁহার গোয়াবাগানের বাসভব হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় পরলোকগত হইয়াছেন মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। ই যৌবনে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনা এটর্ণি ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনকালে ইনি আই ব্যবসায় ত্যাগপূর্ব্বক প্রাচ্য সভ্যতা ও শিক্ষার ভ হইয়া দেশহিতকর আন্দোলনে যোগদান করেন। ই শিক্ষা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সভাসমিতি ও গ্র প্রকাশ দ্বারা বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শেষজীব "ভারতের সাধনা" "বিশ্ববাণী" প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সহিত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হইয়া তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহাঁর শোক সন্তপ্ত পুত্রকন্যাদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

মহাত্মা টমাস এডিসন।—আমরা সংবাদ-পত্রে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাত্মা টমাস্ এডিসন সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের বিক্রেতারূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। ২২ বৎসর বয়স হইতে তিনি কয়েক বৎসর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে টেলিগ্রাম বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবানের বিধানে সেই কার্য্য হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান সংগ্রথিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও স্বীয় প্রতিভাবলে তড়িৎসংক্রান্ত বিষয়ে এতই উন্নতি করিয়াছিলেন যে, বলিতে গেলে, ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম আসন লাভ করিয়াছিলেন। তড়িৎসংক্রান্ত কোন কথা তিনি বলিলে তাহা উপেক্ষা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তিনি গ্রামোফোনের সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কারের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনকালে তিনি সহস্রাধিক বিজ্ঞানভিত্তি নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি অতি সংযতভাবে জীবন পরিচালিত করিবার ফলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা দেশবাসীকে এইরূপ মহাপুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলি।

আদিব্রাহ্মসমাজ

১৮৫২ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

আয় ও ব্যয়।

১৮৫২ শক। ১৩৩৭ সাল।

আয়	৫৮৫১/৬
পূর্ব্বস্থিত	১৩৮৮৵৩
সমষ্টি	৪০২০৻৩
ব্যয়	৩৮০৬/০
স্থিত	২১৩৮৵৯

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২৪০৲
উৎসবের দান	২৲
বার্‌ডওয়ার হাউস	১০০৲
এককালীন দান	৬৲
আনুষ্ঠানিক দান	৪৲
গচ্ছিত আদায়	৫২৬৸৯
গচ্ছিত টাকার সুদ	১২৸৯
সমষ্টি	৩০৫২॥/৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৯০৷৴০
হাল	১০৫৲
বিজ্ঞাপন	২১৮৲
মাশুল	১৩৷৶০
নগদ	২৲
অগ্রিম	২৷৵০
সমষ্টি	৪৩১৷৷০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৪৬৷৴৬
মাশুল	২৸৬
কমিশন	১৵৩
গচ্ছিত	৬৸০
সমষ্টি	৫৭৷৵৩

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	২৫৪৵৩
কাগজের মূল্য	৪৪৷৴৬
দপ্তরী	৭৲
সমষ্টি	৩০৫৷/৯
সর্ব্বমোট	৩৮৫১/৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১২০৲
গায়ক	৩৬৬৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬৫৲
তিঃ রক্ষক	১৩০৲
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২৭৲
পাখাকুলি	৬৷৵০
মাশুল	২২৷৴৩
Electric	৭৪৷/০
আলো মেরামত	২৸০
কেরোসিন	৭৸/০
বারবরদারী	৫৩৸৵৬
Tax	১৮৪/০
বিবিধ	৫২৸৵৯
চৈত্র-সংক্রান্তি	৬৷৵৯
সরঞ্জামী	১৬৷/০
পূর্ত্তকার্য্য	১৪১৸/৬
মেডিকেল মিশন	৯৴৯
পার্ব্বণী	২৷০
পাখা মেরামত	১৫৲
মাঘোৎসব	৪৮৷/০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	২৲
সমষ্টি	১৪৯৮৷৴৬

তত্ত্ববোধিনী।

[ক]াগজের মূল্য	২৩০৷৴৯
[ম]ুদ্রী	৫৫৷৵০
[প্র]বন্ধ	২৭৷৷৴৬
[মা]শুল	৬৪৷৯
[কর্ম্মা]ধ্যক্ষ	৬৫৲
[তিঃ] রক্ষক	১৩০৲
[...]া আদায়ের কমিশন	১৯৷০
[বি]জ্ঞাপনের কমিশন	১২৲
[বি]জ্ঞাপন	১৲
[বি]বিধ	৫৸৵০
[সম]ষ্টি	৬০০৸০

পুস্তকালয়।

[ক]মিশন	৪৸৵৩
[মা]শুল	৪৴০
[পু]স্তক ক্রয়	৮৸৵৬
[বি]বিধ	৷৴০
[সম]ষ্টি	১৮৷৵৯

যন্ত্রালয়।

[ক]ম্পোজিটর	৩৭৬৵০
[প্রে]সম্যান	২৩১৷৷০
[ইন]ক্‌মান	৮৮৸৴৬
[ক]াগজ তোলা	৭৯৷৷৵৩
[কর্ম্মা]ধ্যক্ষ	৬৫৲
[তিঃ] রক্ষক	১৩০৲
[...]ক কাগজ	৩৸৯
[...]পার কাগজ	১৭০৴৯
[...]লি	১২৷৵০
[...]৮ল	৬৷০
[...]মাক	৪৸৬
[...]জিমাটি	৩৲
[...]কচালা	২৵০
[মা]শুল	৴৬
[অ]তিরিক্ত পারিশ্রমিক	৯৬৵৯
[...]ই জন্য ময়দা	১৷/০
[ম]ুদ্রী	৭৫৷৴০
[বি]বিধ	৯৸৵৬
[...]লপানী	২৵০
[...]রিষ	২/৬
[...]শ	৸৴০
[...]ড়	৸০
[...]ল ঢালা	২৷৵০
[...]ক্ষর ক্রয়	২৪৯
[সম]ষ্টি	১৬৪৭৸৵৯
[সর্ব্ব]মোট	৩৮০৬/০

	আয়	ব্যয়	
ব্রাহ্মসমাজ	৩০৫৬৷/৬	১৪৯৮৷৴৬	১৫৫৭৸৵০
তত্ত্ববোধিনী	৪৩১৷৷০	৬০০৸০	১৬৯৷০
পুস্তকালয়	৫৭৷৵৩	১৮৷৷৵৯	৩৮৷৴৬
যন্ত্রালয়	৩০৫৷/৯	১৬৪৭৸৵৯	১৩৪২৷/০
	৩৮৫১/৬	৩৮০৬/০ + ১৫৯৬৷/৬ — ১৫৫১৷/০ = + ৪৫৫	

১৭৬৫ শক ১৭ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৮

১৮৫৩ শক আশ্বিন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮৭। চরণ পূজার আনন্দ।

মা! সুখ সুখ করিয়া সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কোথাও তো সুখ পাইলাম না। তোমার প্রশান্ত ও সুস্নিগ্ধ মুখ যখন দেখি, আর তোমার চরণ যখন বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া পূজা করিতে পারি, তখনই একমাত্র সুখ পাই। সে সুখ যে কি, সেই সুখটুকু পাইবার জন্য প্রাণ সর্ব্বদা কি দুরুদুরু করিতে থাকে, তাহা আর কাহাকে জানাইব? আমার হৃদয় তো তোমার নিকট শত অপরাধের কালিমায় বর্ষার কৃষ্ণবর্ণ জলদের আকার ধারণ করিয়াছে। মা! তুমি না ক্ষমা করিলে আর কে ক্ষমা করিবে? তুমি তোমার তেজে সেই মেঘগুলি কাটাইয়া ফুটাইয়া না দিলে আর কে সেই দুঃখের কালিমা বিদূরিত করিতে পারে? আমি বড় ভুল করিয়া বহুকাল তোমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। তাহার উপযুক্ত শাস্তি যথেষ্টই পাইয়াছি ও পাইতেছি। জননী! আর কেন? আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আর আমাকে কোলে তুলিয়া একটীবার আদর কর। আমার অন্তর তো তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ—একবার দেখ—আমি তোমাকে কত ভালবাসি। একবার আমার অন্তরে আসিয়া তুমি তোমার করুণার ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাও। মৃত্যুর বেড়াজালে পড়িয়া গিয়াছি—আমাকে তুমি তাহা হইতে রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে? একটুখানি জীবনবারি দাও—আমার দগ্ধ তৃষাতুর হৃদয় এটুখানি শান্তি লাভ করুক। তোমা হইতে দূরে বিপথে গিয়া কত যে দূরদূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—পথের সন্ধান কেহই বলিতে চাহে না; বরঞ্চ পথভ্রান্ত আমার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখিয়া আমার প্রতি ঘৃণাদৃষ্টিই নিক্ষেপ করিতে থাকে। সে যে কি কষ্ট গিয়াছে, তাহা একমাত্র তুমিই জান। শেষে জানি না কে, কিন্তু অন্তরে কে যেন বলিয়া দিল যে, তুমিই আমাকে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিলে। আমি সেই পথ ধরিয়া আজ এই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়া তোমার চরণের দাস হইয়া, তোমার চরণপূজার অবসর পাইয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তেমন আনন্দ সারা জীবনেও পাই নাই। দুঃখ বিষাদের মধ্যেও

যে সুখশান্তি পাইয়াছি, তেমন নিবিড় সুখশান্তি সারা জীবনেও পাই নাই। এখন দিনে নিশীথে তোমার শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিকে জীবনের সঙ্গী করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হইয়া গিয়াছি। এখন বাতাসের প্রতি হিল্লোলে তোমারই নিশ্বাস অনুভব করি; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তোমারই শুভ্র সৌন্দর্য্য দেখি; ফুলের সুবাসে তোমারই গায়ের সুগন্ধ পাই। মানুষের ভালবাসায় তোমারই নিবিড় প্রেমের স্পর্শ পাই। মা! এই ক্ষুদ্র কুটীরে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াই মুক্তির মাধুর্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ। আমি নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া যাহাতে তোমার পূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পারি—দেখিয়া দেখিয়া তোমার আলিঙ্গনে ও আদরে মিশিয়া যাইতে পারি, তাহারই একটুখানি অবসর দাও।

৮৮। চরণ-ধূলি।

মা! আমাকে তোমার চরণধূলি হইয়া থাকিতে দাও। আমি তোমার নিত্য অনুচর ও দাস হইয়া থাকিতে চাহি। তুমি আমাকে যতই কেন ঝাড়িয়া ফেল না, আমি তোমার জানত বা অজানত তোমার ঐ চরণেই লাগিয়া থাকিব। আমার প্রাণ যখন সংসারের কঠিন চাপে স্পন্দহীন হইবার উপক্রম করিবে, তখন তোমার ঐ চরণের উত্তাপই আবার আমার প্রাণে জীবন ফিরাইয়া আনিবে। জননী! আমি আপনার দোষে যখন তোমার মুখের প্রসন্নতা হারাইয়া ফেলি, তখন কি বা চন্দ্রসূর্য্য, কি বা গ্রহতারকা, কোন কিছুরই জ্যোতি আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারে না। তুমি জান কি না জানি না, আমার দুই গাল বহিয়া নিরন্তর অশ্রুধারা তোমার ঐ চরণে ঝরিতে থাকে। সেই অশ্রুধারায় দৃষ্টি নির্ম্মল হইলে তবে তোমার প্রসন্ন মুখ আবার সম্মুখে আসিয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে থাকে। আমি তোমার বড়ই দীনদুঃখী সন্তান। আমি কাহাকেও ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া তোমার সম্মুখে গর্ব্বে দর্পে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইতে চাহি না; আমি অতি নীরবে তোমার চরণতলের এককোণে আসিয়া সকলের অজ্ঞাতে শুধু তোমার চরণস্পর্শ টুকু অনুভব করিতে চাহি। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যেমন অহল্যার পাষাণহৃদয়ও সজীব হইয়া সকল সন্তাবের উৎসরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, জননী! দাও—দাও আমার বক্ষে তোমার ঐ চরণ তুলিয়া; আমারও পাষাণপ্রাণে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির জীবনপ্রদ উৎসসকল শতধারে উৎসারিত হইয়া উঠুক। তোমার চরণস্পর্শে আমার জীবনে শান্তিধারা বহিয়া যাক। মেঘসকল যখন বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তখন তুমিই তো তাহা-দিগকে প্রচুর জলদান করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর। সেইরূপ মা! আমিও তোমার একবিন্দু স্নেহের জন্য আকুলপ্রাণে তোমার চরণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তোমার স্নেহের ধারায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটীকে ভরিয়া দাও। তুমি আমাকে তোমার কোলে তুলিয়া লও; একটীবার আদর করিয়া আমাকে ডাক—সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা অন্ততঃ এক মুহুর্ত্তেরও জন্য মুছিয়া যাক। তুমি একবার আমাকে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাও, আমার সমস্ত জীবন সফল হউক। মা! তোমার চরণে এতই অপরাধ করিয়াছি যে, এই আশাটুকু করিতেও ভয়ে প্রাণ দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠে।

৮৯। প্রেমলীলা।

মা! তারাগুলি যখন আমার পানে তাকাইয়া থাকে, আর আমি যখন তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকি, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম যে কি প্রকার উছলিয়া উঠে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয় যেন উহারা তোমার নির্নিমেষ নয়নের নিমেষের আকারেই দেখা দিতেছে। ফুলেরা যখন আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে, আর আমি যখন তাহাদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া হাসিতে থাকি, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আর আমরা উভয়েই আনন্দের হাসি হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া যাই। ফুলেদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহাদের মধ্যে তোমারই বিশুভ্র হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখি। আমি তো তখন আর থাকিতে পারি না; তোমার কোলে উঠিয়া একবার তোমার গাঢ় আলিঙ্গন পাইতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন ইচ্ছা হয়, তুমি গুনগুন স্বরে গান গাও, আমি সেই গান শুনি, আর তোমার

মুখের সুবিমল ছবি প্রাণের ভিতর আঁকিয়া লইয়া তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়ি। আমি তোমার এক দীনদুঃখী সন্তান। কিন্তু তুমি আমাকে কত রাজভোগের দ্রব্য দিতেছ। সে সমস্ত দেখিয়াই তো আমার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। আমি চাই, সকলের অজ্ঞাতে তোমার ঐ চরণতলে নীরবে বসিয়া থাকি। আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমা হইতে তুমি দূরে যাইও না, আমাকে তুমি দূরে সরাইয়া রাখিও না। তোমার কোলে আমাকে শান্তিতে নিদ্রা যাইতে দাও। রাত্রি তোমার ধাত্রী হইয়া আসিয়া আমার চক্ষে স্বপ্নের হাত বুলাইয়া দিক। প্রভাতে উঠিয়া যেন তোমারই প্রসন্ন মুখ সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাই।

২০। পাথেয়।

মা! আমার জীবনের এই জীর্ণ তরীখানি তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছি। আমার বাহু-যুগল বড়ই দুর্ব্বল; আমার পদযুগল বড়ই শ্লথ। তুমি এখন যদি ইচ্ছা কর, ইহাতে পাল তুলিয়া দাও—ইহা তরতর করিয়া তোমার ইঙ্গিত ধরিয়া চলুক। পাল তুলিয়া দিতে যদি না চাও, তবে তরীখানি এইখানেই থাকিয়া জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া তোমারই পদতলে ভাঙ্গিয়া পড়ুক। ভাঙ্গিয়া পড়িলেই যেন বাঁচি—তাহা হইলে আমায় তুমি তুলিয়া না ধরিয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা আমি ঠিক জানি। আমি তোমার নিকট যতই কেন অপরাধ করি না, তবু আমি তোমার সন্তান; তোমার সঙ্গে আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যোগ—সে যোগ অনন্তকালেও ছিন্ন হইবার নয়। অন্তরে এই সাড়া পাইয়াছি যে, পিতামাতার নিকট সন্তানের ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু চির-অপরাধ হইতে পারে না। মা! আজ এই শরতের প্রথম প্রভাতে সূর্য্য তাহার কিরণজালে সমস্ত গগন ভরিয়া দিয়াছে, তুমিও তেমনি আমায় কোলে লইয়া তোমার আদরচুম্বনে আমাকে ভরিয়া দাও। তোমার গাত্রের সুগন্ধে আমার প্রাণ এখনই ভরিয়া উঠিয়াছে। তোমার সঙ্গে আমি একপ্রাণে মিশিয়া থাকিব, একহৃদয়ে চিন্তা করিব, অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া অনন্তকাল এক-সঙ্গে বাস করিব, ইহা ভাবিয়াই তো আনন্দে আকুল হইয়া উঠিতেছি। তুমি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে, আমিও তোমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিব—এই নিরবধি আনন্দের সীমা কোথায়! তুমি আমার মাথায় তোমার মঙ্গলহস্ত রাখিয়া সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ দিবে—আর আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। তুমি যে পথ দিয়া চলিবে, সেই পথের ধূলিকণাও আমার কাছে পরম পবিত্র—আমি সেই ধূলি-ধূসরিত দেহ লইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইব; তখন তুমি তোমার যে বাণী শুনাইয়া আমার প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিবে, তাহাই আমার নিকট অনন্ত পথের পাথেয় হইবে।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?

(৺বিপিনবিহারী ঘোষাল)

ভারতের হিমালয় যেমন উন্নত এবং প্রশস্ত ভারতের হিন্দুধর্ম্মও সেইরূপ উদার এবং মহান্। হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বর-বাদপ্রধান ধর্ম্ম। "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি?" অতি সংক্ষেপে এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কেবল একমাত্র নিরাকার সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার নামই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। তবে যে শাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার সাকার দেবদেবীর পূজা বা কর্ম্ম-কাণ্ডের উল্লেখ আছে, সে কেবল নিতান্ত অল্পবুদ্ধি অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিহীন লোকদিগকে দুশ্চেষ্টাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত, একএকটি রূপকবর্ণন বা এক-এক প্রকার কল্পনার অবতারণা মাত্র। যথা, ভগবান শিব তন্ত্রশাস্ত্রে মৃত্তিকা, শিলা বা ধাতুময়ী দেবতা-মূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিয়া শেষে এই কথা বলিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন; যে,—

> অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং।
> প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিত-নিবৃত্তয়ে॥
> মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ১৪শ উল্লাস, ১০৬ শ্লোক।

হে পার্ব্বতী! এই যে সাধনযুক্ত বহুপ্রকার কর্ম্মের কথা বলিলাম, এ সমস্ত কেবল অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে দুশ্চেষ্টাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন; যথা,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২শ স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়, ৯ শ্লোক।

সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবে, যে পর্য্যন্ত তাহাতে দুঃখবুদ্ধি অর্থাৎ বিরক্তি না জন্মে; অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথাশ্রবণ-মননাদিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ প্রবৃত্তি না হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মবিষয়ে একটুকু শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্তই সাকার উপাসনাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন। ধর্ম্মবিষয়ে অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণ-মননে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি জন্মিলে আর কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই।

এক সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় পুরুষ ব্যতিরেকে অপর যত-প্রকার দেবদেবীর উল্লেখ শাস্ত্রমধ্যে আছে, সে সমস্তই যে নিতান্ত অজ্ঞান অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিহীন লোকদিগের জন্য কেবল রূপক বর্ণন বা কল্পনার লীলাখেলা মাত্র, একথা শাস্ত্রকারগণ ভূয়ঃ ভূয়ঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া গিয়াছেন। যথা, ভগবান শিব তন্ত্রশাস্ত্রে একপক্ষে যেমন বহুপ্রকার দেবদেবীর ধ্যান, পূজা, বা মন্দিরপ্রতিষ্ঠাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই ধ্যান, পূজা বা মন্দিরপ্রতিষ্ঠাদির বিবিধ প্রকার ফলের * কথাও লিখিয়া গিয়াছেন, অপরপক্ষে সেইরূপ সিদ্ধান্তকালে তাহাদিগের প্রতি বারম্বার কল্পনাশব্দ প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। যথা,—

অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নাম-রূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৮ম উল্লাস, ২৮৬ শ্লোক।

হে পার্ব্বতি! (অপ্রাপ্তজ্ঞান বা অকাতরে বাপ্য ব্যক্তিদিগের) চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণমননাদিতে রতি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার নিমিত্তই আমি কর্ম্ম-বিধিসকলের উল্লেখ করিয়াছি; এবং কেবল সেই উদ্দেশ্যেই বহুবিধ নাম ও রূপের (অর্থাৎ দেবমূর্ত্তিসকলের) কল্পনা করিয়াছি।

ভগবান শিব অপর একস্থানে বলিয়াছেন:—

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ১৩শ উল্লাস, ১ শ্লোক।

এইরূপ গুণ অনুসারে নানা প্রকার রূপ (অর্থাৎ সাকার দেবমূর্ত্তিসকল। অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের জন্য কল্পনা করা হইয়াছে।

সাকার দেবদেবী সম্বন্ধে ভগবান শিব এইরূপ কল্পনা শব্দ আরও অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন; বাহুল্য ভয়ে সে সকল আর এখানে উল্লেখ করিলাম না। †

ভগবান ব্যাসদেব সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া শেষে ১২শ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে স্পষ্ট বলিলেন যে, ভগবান নারায়ণ চৈতন্য ঘন মাত্র; তাঁহার এই যে রূপ বর্ণন এ কেবল কল্পনা। এতদ্ব্যতীত সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অবশেষে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন; যে,—

রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তা হখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রূপ বিবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে আঘাত

---

* কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানজনিত স্বর্গাদি ফলকথন যে শাস্ত্রে কেন আছে, তাহাও দেখান যাইতেছে; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন; যথা,—

মূঢ়ানাং ভোগদৃষ্টানামাত্মানাত্মাবিবেকিনাং।
রুচয়ে চাধিকারায় বিদধাতি ফলং শ্রুতিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ।

ভোগাভিলাষে অনুরক্ত আত্মানাত্মবিবেক-বিহীন মূর্খগণের ধর্ম্মবিষয়ে রুচি এবং অধিকারের নিমিত্তই কেবল শাস্ত্রে ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভগবান রঘুনন্দন স্মার্ত্তের মলমাসতত্ত্বের মুমুক্ষুকৃত্য নামক প্রস্তাবেও এইরূপ বচন লিখিত হইয়াছে; যথা,—

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড-লড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপাতি বালকাঃ॥

পিতা বা অন্যান্য গুরুজনেরা যে প্রকার ক্ষুদ্র শিশুকে নিম্বাদি তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার পূর্ব্বে লাড্ডুক বা মোদকাদির প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, বেদাদি শাস্ত্রসকলও সেইরূপ বহুপ্রকার কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের রুচি বা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন মাত্র।

† যদিও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে দুশ্চেষ্টাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মপথে তাহাদিগের রুচি উৎপাদনার্থ শাস্ত্রকারগণ নানা প্রকার কল্পনার ব্যবহার করিয়াছেন, তথাচ অচিন্ত্য সত্যস্বরূপ পরম বস্তু পরমেশ্বর যে কোন প্রকার কল্পনার যোগ্য নহেন, এ কথাও তাঁহারা আপনারাই বলিয়া গিয়াছেন; যথা, ভগবান বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছেন,—

তস্তে ব্রহ্মঘনে নিত্যে সম্ভবন্তি ন কল্পনাঃ।
বিচ্ছিত্তয়ঃ পয়োরাশৌ যথা রাম জলে ভবাঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উপশমপ্রকরণ।

হে রাম! যেমন জলরাশি মধ্যে জলচ্ছেদ সম্ভবে না সেইরূপ নিত্য, নিবিড়, সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে কোন রূপ কল্পনাদিই সম্ভব হয় না।

করিয়াছি, হে জগদীশ্বর! আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর। *

ভগবান রঘুনন্দন স্মার্ত্ত একাদশীতত্ত্বে বিষ্ণুপূজন-বিধি আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই এই নিম্নলিখিত যমদগ্নির বচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; পরে বিষ্ণুপূজা-সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুং-স্ত্র্যংশাদিকল্পনা॥

জ্ঞানযোগ রহিত ভক্তদিগের সুবিধার নিমিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত অর্থাৎ নিরাকার পরমেশ্বরের রূপ অর্থাৎ আকার কল্পনা করা হইয়াছে; এবং রূপকল্পনা যখন করিতে হইয়াছে, তখন স্ত্রীর অবয়ব ও পুরুষের অবয়ব এই উভয় প্রকার অবয়বই কল্পনা করা হইয়াছে।

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থেও এই শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এবং তথায় 'উপাসকানাং' শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে; যথা, "উপাসকানাং,—জ্ঞানযোগ-রহিতভক্তানাং"।

বেদান্তসারের অধিকরণমালায় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ মীমাংসা দেখা যায়; যথা,—

ব্রহ্ম কিং রূপি বারূপি ভবেন্নীরূপমেব বা।
দ্বিবিধ-শ্রুতিসদ্ভাবাদ্ব্রহ্ম স্যাদুভয়াত্মকং॥
নীরূপমেব বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যমপূর্ব্বতঃ।
রূপং ত্বনূদ্যতে ভ্রান্তমুভয়ত্বং বিরুদ্ধতে॥

তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, ৫ম অধিকরণ।

প্রথমতঃ প্রশ্ন করিতেছেন—"পরমেশ্বর কি রূপি, অর্থাৎ সাকার? অথবা রূপি এবং নীরূপ অর্থাৎ সাকার এবং নিরাকার উভয়ই?"

ইহাতে বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, যে—"বেদাদি শাস্ত্রে যখন উভয় প্রকারেরই বর্ণন আছে, তখন পরমেশ্বর সাকার এবং নিরাকার উভয়ই"।

অবশেষে এই উত্তর পক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে,—"পরমেশ্বর যে নিরাকার তাহা বেদান্তশাস্ত্রে অতি চমৎকাররূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তবে যে কোন কোন শাস্ত্রে স্থলবিশেষে তাঁহাকে সাকাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে, সে কেবল ভ্রান্ত লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য মাত্র। নতুবা এক বস্তুরই সাকার এবং নিরাকার এই উভয় রূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ উহা শাস্ত্র যুক্তি এবং অনুভব এ সকলেরই বিরুদ্ধ"। †

বস্তুতঃ পরমেশ্বর যিনি তিনি মনুষ্য-ঔরসে মানবীর গর্ভে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কতবার প্রিয়া-বিয়োগে কাঁদিয়াছেন, কখনও ভ্রাতৃবিয়োগ-শোকে নদীর স্রোতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, কখনও বা পত্নীর মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, কখনও শত্রুভয়ে ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছেন, কখনও নিজে মিথ্যা কথা কহিয়াছেন, কখনও বা অপরকে মিথ্যা কহিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কখনও অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনও বা বানরের সাহায্য ব্যতিরেকে শত্রুর অন্বেষণে—অধিক কি, শত্রুর কোনরূপ সন্ধান লাভ পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম হন নাই; ইত্যাদি বর্ণনাসকল যে কতদূর সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত তাহাও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে বিবেচনা করিবেন;

* ভগবান শঙ্কর স্বামীও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া শেষে ঠিক এই কথা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

† কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, পরমেশ্বর যখন অচিন্ত্য ক্ষমতাশালী, তখন ইচ্ছা করিলে মানব-রূপে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু কথা এই যে, সর্ব্বশক্তিমত্তার এইরূপ অর্থ করিতে গেলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব থাকে না। তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপসকল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; এবং তিনি জন্ম-মরণাদি মানবধর্ম্মের আয়ত্ত হইয়া প্রকৃত মানবরূপে পরিণত হইয়া যান। পরন্তু যদি তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হইতে পারিত, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইতে পারিত। ইহা অতি ভয়ানক মীমাংসা। অবতারত্ব বজায় রাখিতে যাইয়া নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত বেদাদিশাস্ত্রে যে তাঁহাকে অজ, অব্যয়, নিত্য ও নির্ব্বিকার শব্দে বারম্বার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আর এক কথা এই যে, মানবীয় যত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তাহার কোনটীরই উন্নতি বা আবিষ্কারের জন্য যখন পরমেশ্বরর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা আবশ্যক হয় নাই—তখন ধর্ম্মবিষয়েও যে তিনি সেই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ একটি শ্লোক লিখিত আছে; যথা,—

জন্মাপবাদং দ্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাবভাষণং।
কামং ক্রোধং তথা চৌর্য্যং পরদারাভিমর্ষণং।
বীভৎসং মরণং ক্ষোভং দুঃক্রিয়া বিবিধাঃ কলৌ।
পাষণ্ডনো বিধাস্যন্তি বিশুদ্ধে পরমাত্মনি॥

বর্দ্ধমান-রাজসংসার হইতে প্রকাশিত—"ভ্রমবিনাশ" নামক গ্রন্থধৃত ভবিষ্যপুরাণের বচন।

কলিযুগে পাষণ্ড ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ পরমাত্মাতে জন্ম-অপবাদ, দ্রোহ, মিথ্যাকথন; কাম, ক্রোধ, চৌর্য্য, পরনারী-প্রপীড়ন, বীভৎস, মরণ, ক্ষোভ এবং বিবিধ দুঃক্রিয়া বিধান করিবে।

আর যাঁহারা সত্য সত্যই নিরাকার পরমেশ্বরের মধ্যে মধ্যে একএক প্রকার সাকার মূর্ত্তি ধারণ করায় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদিগেরও এই এক কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, "ভগবান্ নিত্যকাল যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ যাহা তাঁহার প্রকৃত ভাব, সেই ভাবটী পরিত্যাগ করিয়া কবে কোন্ কালে কি উপলক্ষে কয়েক বৎসরের জন্য কি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে যে রূপ তাঁহার আর নাই, সেই রূপের চিন্তা করা কি ভ্রান্তচিত্ততার কার্য্য নয়" ?

ভগবান যুধিষ্ঠির, যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম আত্মীয় সখা এবং আশ্রিত ছিলেন, যিনি চিরজীবন কৃষ্ণের সহিত অতিবাহিত করিলেন, তিনিও যে মহাপ্রস্থানকালে কৃষ্ণমূর্ত্তির চিন্তা না করিয়া নিরাকার পরমব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই বা কি জানা যায় ; যথা—

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তেত যতো গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ১৫শ অধ্যায়, ৪৩ শ্লোক।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হৃদয়ে পরব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে উত্তরদিকে গমন করিলেন। তাঁহার মহাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সেইদিকে গমন করিয়াছিলেন, সে পথ অবলম্বন করিলে আর ফিরিতে হইত না।

আর মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবের মুখে গঙ্গাতীরে সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওতঃ যখন সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন তিনিও সেই নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ; যথা,—শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

ভগবান শিব এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, যে—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র ১৪শ উল্লাস, ১১৮ শ্লোক।

যদি মনের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিসকল মনুষ্যকে মুক্তি দিতে পারিত, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থায় লব্ধ যে রাজ্য, তাহা দ্বারাও মনুষ্য রাজা বলিয়া গণ্য হইত।

শাস্ত্রকারগণ :সাকার উপাসনা একেবারে উঠাইয়া দিতে না বলিয়া যাহারা একান্তপক্ষে নিরাকার উপাসনায় অক্ষম, এপ্রকার সামান্যবুদ্ধি অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য অপারক পক্ষে অনুকল্প ব্যবস্থারূপে উহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন মাত্র। যথা,—

অমূর্ত্তে চেৎ স্থিরো ন স্যাৎ ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ।

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী-ধৃত গরুড়পুরাণের বচন।

যদি অমূর্ত্তি অর্থাৎ আকার-বিহীন সূক্ষ্ম পরমেশ্বরে মনের স্থিরতা করিতে না পার, তাহা হইলে মূর্ত্তি চিন্তা করিবে।

অসমর্থো মনো ধাতুং নিত্যে নির্ব্বিষয়ে বিভৌ।
শব্দৈঃ প্রতীকৈরর্চাভিরুপাসীত যথাক্রমং॥

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যধৃত বচন।

নিত্য, উপাধিশূন্য, সূক্ষ্ম বস্তু পরমেশ্বরেতে যদ্যপি মনকে ধারণ করিতে না পার, তাহা হইলে স্তোত্রপাঠাদি শব্দের দ্বারা, কিম্বা তদভাবে কোনরূপ অবয়বচিন্তার দ্বারা অথবা শেষ পক্ষে প্রতিমাদি গঠন দ্বারা ক্রমে ক্রমে উপাসনার পথে অগ্রসর হইবেক।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারগণ যদিও অসমর্থ পক্ষে সাকার উপাসনার বিধি দিয়াছেন, তথাচ কতদূর অনিচ্ছার সহিত যে তাঁহারা এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিলে আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহার স্মৃতিতে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা,—

"অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা-পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশমনোবুদ্ধ্যাত্মাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ লক্ষ্যস্তৎ পরিত্যজ্য পরমপরং ধ্যায়েৎ। এবং পুরুষধ্যানমারভেত। তত্রাপ্যসমর্থঃ ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাবিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরং চরণমধ্যগত-ভুবং ধ্যায়েৎ"।

বিষ্ণুসংহিতা, ৯৭ অধ্যায়।

যদি কেহ নিরাকার পুরুষে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারেন, তবে তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী চিন্তা, পরে জল চিন্তা, তদনন্তর তেজঃ বায়ু ও আকাশ চিন্তা, শেষে মন বুদ্ধি জীবাত্মা ও অব্যক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে শক্তি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহার চিন্তা এবং সর্ব্বশেষে প্রকৃতির অতীত যে পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তা করিবেন।

যদি এ ভাবেও ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচিন্তা অভ্যাস করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার হৃদয়পদ্মের মধ্যে দীপবৎ পুরুষ চিন্তা করিবেন।

যদ্যপি তাহাতেও অসমর্থ হন, তাহা হইলে শেষপক্ষে কিরীট-কুণ্ডলাদিযুক্ত, শ্রীবৎস-চিহ্নিত বনমালা-বিভূষিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ সৌম্যমূর্ত্তি চিন্তত করিবেন।

তবেই দেখুন কতদূর অপারক পক্ষে মূর্ত্তি চিন্তার ব্যবস্থা।

বিদেহ আত্মার সহিত কথোপকথন সম্ভব কি না? *

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। প্রশ্ন—কথোপকথন সম্ভব কি না ?

কেহ কেহ বলেন যে, মৃত্যুর পরপার হইতে পরলোকগত বিদেহ আত্মা ইহলোকের অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথন চালাইতে পারেন না, অথবা চালাইবার চেষ্টা করিলেও এই লোকের অধিবাসীরা তাঁহাদিগের দেহ-যন্ত্রের নানাবিধ সংকীর্ণ সীমা থাকার কারণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদের নিকট ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। টেলিগ্রাফ-যন্ত্র আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সংবাদটী প্রেরিত হইতে পারিবে? বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, সঙ্গীতাদি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরিত হইতে পারিবে?

আমরা ইতিপূর্ব্বে "মৃত্যুর পরে" প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি যে, মৃত্যুর পরেও বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং সেই আত্মার অপর কোন প্রকার দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকাই সম্ভব; জড় দেহের অবসানে আত্মা ঐহিক দেহের নানাবিধ সংকীর্ণ সীমার বাধা অতিক্রম করেন। তখন ইহা একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, পরলোকগত আত্মা মাত্রেরই পক্ষে ইহলোকের অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথন চালান নিতান্তই অসম্ভব—বরঞ্চ সম্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

২। কথোপকথন সম্ভব—বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

জড় বিষয়ের ন্যায় অতীন্দ্রিয় বিষয়েও আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে আমাদের নিকট যে সকল প্রমাণাদি উপস্থিত হইতেছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার তারতম্য অনুসারে পরলোকগত অন্তত কোন কোন আত্মা এলোকের সহিত কথোপকথন চালাইতে পারেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। বিলাতের মনস্তত্ত্বসমিতির কার্য্যবিবরণীতে এইরূপ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

ইহলোকেও দেখা যায় যে, জীবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় বা অজ্ঞান অবস্থায় একের আত্মা আপনাকে দেহ হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিমুক্ত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতে সক্ষম। তখন বিদেহ আত্মার সহিত এই লোকের আত্মার কথোপকথন অসম্ভব মনে করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না।

৩। অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটী দৃষ্টান্ত।

(১) এক ভোর রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমি আমাদেরই বাটীর এক আত্মীয়ার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলাম। ঐ কথোপকথন আমি সদা সদ্য গাত্রোত্থান করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে ঐ আত্মীয়া আমাকে জানাইলেন যে, ঠিক ঐ ভোর রাত্রেই তিনিও আমার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। আমি তখন আমার সেই স্বপ্নলিপিখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। উভয়ের কথোপকথনে আশ্চর্য্য মিল—একটি কথারও অমিল ছিল না।

(২) পূজ্যপাদ পিতামহদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার যৌবনকালে একখানি অতি প্রয়োজনীয় দলিল বহু সন্ধানেও না পাইয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ দলিল না পাওয়া গেলে বহু টাকার লোকসান হইত। সেই সময়ে এক গভীর রাত্রে এক বিদেহ আত্মা আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে সেই দলিলের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশমত স্থানে সন্ধান করিয়া পিতামহদেব দলিলখানি পাইয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, আমি এই কথা তাঁহার মুখে এবং খুড়া জ্যেঠাদিগেরও মুখে শুনিয়াছি।

(৩) আমার এক আত্মীয়া তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতার বিদেহ আত্মার সহিত কিরূপ সহজে কথোপকথন চালাইয়া থাকেন, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। আত্মীয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া তাঁহার ভ্রাতাকে আহ্বান করিলেই, তিনি সহজভাবে আসিয়া উপস্থিত হন এবং আত্মীয়ার প্রশ্নের উত্তরগুলি আত্মীয়ার হস্ত দ্বারা যথাযথ লিখিয়া দেন। আত্মীয়া বলেন যে, লিখিবার সময় তাঁহার হস্তের উপর ভ্রাতার হস্তের চাপ অনুভব করেন।

(৪) আমার এক আত্মীয় তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বহুদূরে অবস্থিত তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সাক্ষাতের পরেই পত্র দ্বারা আমাকে ঐ বিষয় জানাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্রোক্ত সময়ের হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, বিদেহ আত্মা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের জন্য সময়ের অপেক্ষা রাখে—এক মিনিটে আন্দাজ আশী হইতে একশত মাইল যাইতে পারে।

(৫) আমার এক পুত্র তাহার মৃত্যুকালের কিছু পূর্ব্বে তাহার অদৃষ্টপূর্ব্ব বহুপূর্ব্বে পরলোকগত এক পিসীর দর্শন পাইয়াছিল। সেই পিসীকে সে না দেখিলেও সে

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

তাঁহার আকৃতির স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহাতে আমরা সকলেই অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

(৬) আমার এক আত্মীয়া তাঁহার এক পরলোকগত ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার ভ্রাতার পরিবর্ত্তে তাঁহার পরলোকগত পিতৃব্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত পিতৃব্য ইহলোকে অবস্থানকালে কবিতা লিখিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং দু-একখানি কবিতার পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদেহ আত্মাও আসিয়াই নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া দিলেন। যাঁহারা উক্ত কবিতা পাঠ করিলেন, তাঁহাদের পড়িবার ভুলে স্থানে স্থানে ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে. ইহা ঐ আত্মীয়া আমাকে জানাইয়াছেন। কবিতাটী এই :—

ইচ্ছে করেছিলে তুমি তোমার সোনার সংসার
কোথায় ছিল, কেবা পরিচিত কার,
কেন বা আনিলে, কেন বা বাঁধিলে
প্রাণে প্রাণে প্রেমহার।
এবে ইচ্ছে হয়েছে সেই হার হ'তে
একটী কুসুম তার আপনি নিয়েছ
আপনি পরেছ, অভয় পদে আপনার,
আমাদের বুক ফেটে যায় যাক্ ঝরে ঝরুক অশ্রুধার।
তুমি যা ক'রেছ ভালই করেছ,
বলিতে দিও গো বার বার ॥

উক্ত পিতৃব্য তাঁহার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতায় তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

৪। অকারণ বিভীষিকা।

কি উপায়ে যে বিদেহ আত্মা আমাদের সহিত কথোপকথন চালাইবেন, তাহা আমাদের অপেক্ষা তিনি ভালরূপ জানেন। আমরা মৃত্যুর বিভীষিকায় বড়ই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি—বিদেহ আত্মাকে ভূত-প্রেতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভে আতঙ্কিত হইয়া উঠি বলিয়াই আমরা বিদেহ আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার ক্ষমতা হারাইয়া বসি। সেই আতঙ্কই অনেক সময়ে আমাদের জড় মস্তিষ্কেরও বিকৃতির কারণ হয়।

মৃত্যুর পরপারস্থ অথবা পরলোকগত বিদেহ আত্মার সহিত সাক্ষাৎলাভের বিভীষিকায় আমাদের ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। ইহলোকও যেমন বিশ্বপিতা অখিলমাতার রাজ্য, লোক-লোকান্তরও সেইরূপ—তাঁহারই রাজ্য। আমরাও যেমন তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সত্য নিয়মসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি, লোক-লোকান্তরের অধিবাসী আত্মাগণও সেইরূপ তাঁহারই ধর্ম্মনিয়মসমূহ মানিয়া চলিতেছেন। একমাত্র ভগবানেরই অখণ্ড মঙ্গল নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে। ধূলিকণা হইতে উন্নততম আত্মা পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার মঙ্গল নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না।

৫। শাস্ত্রে পরলোকতত্ত্ব।

মৃত্যুর পরপারের কথা এবং সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ও অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল, আমাদের শাস্ত্র অপেক্ষা অপর কোন দেশের কোন শাস্ত্রে অধিকতর বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ভারতের তপোনিষ্ঠ ঋষি-মুনিগণ তাঁহাদের নির্জ্জন সাধনায় এই বিষয়ের প্রতি কঠোর মনোযোগ দিবার ফলে, তাঁহাদের সম্মুখে পরলোকতত্ত্বের দ্বার যে প্রকার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, কোন দেশের কোন সাধকের সম্মুখে উহা সে প্রকার প্রশস্তরূপে উন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই না। ইহারই ফলে আমাদের বেদ-বেদান্তে ও পুরাণ-তন্ত্রে অধ্যাত্মতত্ত্ব পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথাসকল অপূর্ব্ব ভাষায় ও ভাবে পত্রে পত্রে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, আমরা সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিদেশীয় সাধকদিগের উক্তির প্রতি, বিদেশের শাস্ত্রের প্রতি, সমধিক মনোযোগ প্রদান করিয়া এই সকল তত্ত্ব অধিগত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকি।

ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ ॥

পথ ও পাথেয়।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ)

ক্ষীণ পথরেখা এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে কত গ্রাম-জনপদ অতিক্রম করে, কত গিরিদরী উল্লঙ্ঘন করে, কত প্রান্তর-বন-বনানীর ভিতর দিয়ে, পল্লীকুটিরের পাশ দিয়ে অজানা কত শত নূতন দেশে। এই পথ ধরে পথিক চলে শ্রান্তপদে অলসমন্থরগতিতে স্বীয় অভীষ্টলক্ষ্যে। যখন বন্য-তরু-গুল্ম-কণ্টকলতায় পথ দুর্গম হয়ে উঠে, তখনই মানুষ তাকে সুগম কর্ব্বার চেষ্টা করে; বিশাল স্রোতস্বতীর বক্ষে রমণীয় সেতু নির্ম্মিত হয়; তুঙ্গ পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করে মানুষের রাস্তা তৈয়ারী হয়; ছায়াবহুল বনস্পতি পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে পথিকের ক্লান্ত দেহে ছায়া বিস্তার কর্‌তে থাকে। পথের ধারে ধারে কোথাও স্বচ্ছসলিলা শ্যামল-শৈবালদলবিমণ্ডিতা সরসী,

কোথাও নির্ম্মল কূপ পথিকের তৃষ্ণার জল বুকে করে দণ্ডায়মান ; কোথাও নির্জ্জন প্রান্তর বুকে ক্ষুদ্র আপণ-মালা দ্রব্যসম্ভার সাজিয়ে পথিকের খাদ্যসমস্যার মীমাংসায় নিরত ; কোথাও শস্পাচ্ছাদিত পর্ণকুটীর নৈশাবাস রচনা করে পথিককে আহ্বান করে। কিন্তু পথ যখন এমন দেশের মধ্য দিয়ে যায়, যেখানে বৃক্ষ নেই, লতা নেই, কূপ নেই, সরোবর নেই, খাদ্যদ্রব্যের আপণশ্রেণী পথিকের জন্য বক্ষ উন্মুক্ত করে নেই—আছে মাত্র ধূসর বালুকারাশি দিগন্ত হ'তে দিগন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত—তখন সে পথে যেতে হলে পথিক নিজের পাথেয় সঙ্গে করে পথ চলে,—প্রখর সূর্য্যকিরণের হাত থেকে আত্ম-রক্ষা কর্ব্বার জন্য সঙ্গে নেয় আতপত্র, আধারে রাখে জল ; ঝুলিতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে কাঁধে ফেলে গন্তব্যপথে অগ্রসর হয়। আবার সঙ্গে নেয় তখন এমন লোককে যে পথ চেনে, যে হাত ধরে অভীষ্ট স্থানে পৌছে দিতে পার্‌বে—নৈলে যে পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে! সুতরাং যাত্রা-পথে চাই—পথ, পাথেয় ও সঙ্গী।

মানবেরও মহাযাত্রায়—জীবনের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যাবলী ও মৃত্যুর দুর্গম তিমিরাবৃত রাজ্যের মধ্য দিয়ে যে পথ বিস্তৃত, শাশ্বত ব্রহ্মলোকের সেই অভীষ্ট লক্ষ্য-পথে—প্রধানতঃ চাই পথের জ্ঞান, পাথেয় ও সঙ্গী। পার্থিব রাজ্যে যা চাই, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তারই সমতাবযুক্ত সব চাই—নতুবা যাত্রার বিফল প্রচেষ্টা হৃদয় ও মন ব্যথিত করে দেবে, গন্তব্যস্থানে উপনীত হবার কোন আশা আত্মপ্রকাশ কর্‌বে না।

পথ কি? জন্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংসারচক্রের ক্ষুৎপিপাসায়, আশা-বাসনায় নিপীড়িত হয়ে অবিরাম ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছি ; কত সুখ ও দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর স্তরে কত চিহ্নই না এঁকে দিচ্ছে ; শোক ও মোহের ঘনান্ধকারে কতই না নিরাশপ্রাণে বিচরণ কর্‌ছি—পথ ত খুঁজে পাচ্ছি না! কেমন করে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হব?

দেশে দেশে কালে কালে চিন্তাশীল ভাবুকের প্রাণে এই প্রশ্ন নিত্যকাল আঘাত করে বেড়িয়েছে ; তাই মহাভারতে বকরূপী ধর্ম্মের চতুঃপ্রশ্নের মধ্যেও দেখি—"কঃ পন্থা?" পথ কি?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন পথরেখা নির্দ্দেশ করেছেন, দেশের, কালের ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ; কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—গন্তব্যস্থান এক ; তাই বিভিন্ন পথরেখায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে "মহিম্নঃস্তোত্রের" গন্ধর্ব্ব চিত্ররথ বলেছেন—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজু-কুটিল-নানা-পথজুষাং
নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নদী যেমন মহাসমুদ্রে গিয়ে পৌছে ঋজুকুটিল নানা পথ ধ'রে, তেমনি মানবেরও লক্ষ্য এক ব্রহ্মার্ণব।

অনেক সময় দেখি, সব নদী মহাসমুদ্রের শান্ত নীলিমায় আপন ক্ষীণ জলধারা মিশিয়ে দিতে সমর্থ হয় না ; কত নির্ঝরধারা তপ্ত মরুভূমির ধূসর বালুকার মধ্যে আত্মহারা হয়ে মিলিয়ে যায় ; তেমনি সমস্ত পথই যে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে, তারও সম্ভাবনা কম। কোন পথ হয় ত দৃষ্টিহারা কণ্টকবনে লুপ্ত হয়ে গেছে—পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যলাভের চেষ্টায় নিরত ; কোন পথ জনবহুল নগরের প্রান্তে শেষ হয়েছে,—খণ্ডকে সে অখণ্ডের আসন দিয়ে তৃপ্তিলাভ কর্‌ছে। কিন্তু এমন পথও বর্ত্তমান, যে পথ কণ্টকবন অতিক্রম করে, তুঙ্গ পর্ব্বতের অভ্রভেদী বাধা পদতলে দলিত করে, বিশাল প্রান্তরের মহানীরবতায় অঙ্গ মেলে দিয়ে, মহানগরের লোককোলাহলে বধির হয়ে ছুটে চলেছে দূর হতে দূরান্তরে, দিক্ হতে দিগন্তরে, যতক্ষণ না পরব্রহ্মের শাশ্বত লোকে উপনীত হয়—পার্থিব জগতের ধন, জন ও সুখৈশ্বর্য্য যার কাম্য নয়, খণ্ডকে যে অখণ্ড বলে পূজা করে তৃপ্ত হয় না ; পরন্তু অখণ্ড পরব্রহ্মই যার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, ব্রহ্ম-চরণে আত্মনিবেদনই যার একমাত্র কাম্য।

কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার কথোপকথনে এই তত্ত্ব সুপরিস্ফুট হয়েছে। তৃতীয় বরে নচিকেতা যখন যমকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে
নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

তখন, যম নাচিকেতাকে পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ কর্ব্বার চেষ্টা করলেন ; যম বল্লেন—

"যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে
সর্ব্বান্ কামান্ স্বচ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।"

কিন্তু নাচিকেতা যখন কিছুতেই প্রলুব্ধ হলেন না, সুদীর্ঘ আয়ু, সুন্দরী স্ত্রী ও অসীম ধনরত্ন সব প্রত্যাখ্যান কল্লে'ন, তখনই যম তাঁকে ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত করে দিতে বাধ্য হলেন ; কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল—ব্রহ্মজ্ঞান। খণ্ডের মধ্যে ডুবে তিনি অখণ্ডকে ভুলে যেতে রাজী ছিলেন না।

আমরাও যেদিন সংসারের ভোগসুখে মত্ত না হয়ে খণ্ডের মায়া কাটিয়ে, পরব্রহ্মের পরম পদ লাভের জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা হৃদয়প্রদেশে অনুভব করব, তখন আমাদেরও পুরোভাগে শাশ্বত অমৃতময় ব্রহ্মলোকের পথ উন্মুক্ত দেখতে পাব। উপনিষদের অমৃতময়ী বাণী

আকাশে আকাশে, তারায় তারায়, প্রাণের তারে তারে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে; শুনতে পাব বনানীর পল্লব-মর্ম্মরে, নিদ্রাহারা তরঙ্গিণীর অশ্রান্ত কলতানে, জ্যোৎস্নার কোমল আলিঙ্গনে সুপ্তসমুদ্রের গম্ভীর মন্দ্রে, বিহগের কল-কাকলির অভ্যন্তরে—

"ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

পথ অত্যন্ত দুর্গম, কি পাথেয় নিয়ে এ অজানা পথে যাত্রা আরম্ভ কর্ত্তে হবে? আবার কৃচ্ছ্রসাধ্য পথ-চলার মধ্যে দস্যু-তস্করেরও অভাব নেই; প্রতিপদে বিঘ্ন-বিপদের সমাবেশ; সুতরাং এমন পাথেয় চাই, যা সমস্ত বিঘ্ন-বিপদের হাত থেকে মুক্ত করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিতে পারবে। কি সে পাথেয়? শ্রুতি বল্লেন, সে পাথেয় আনন্দ—যা থেকে বিশ্বসংসার উদ্ভূত; যার বলে ত্রিভুবন জীবিত; আবার অন্তিমে যার মধ্যে সমস্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাবে। সমস্যা গভীর আকার ধারণ করল! বিশ্বের বাজারে প্রতিপদে হতমান, জাগতিক শোকমোহে অভিভূত, দুঃখদারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে নিপীড়িত, হর্ষসুখের সামান্য স্পন্দনতালে উৎফুল্লবক্ষ, বিপদে ভয়াকুল, সম্পদে আত্মহারা মানব আনন্দের সন্ধান কোথায় পাবে, যার বলে সে অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমাতে সমর্থ হবে?

আর্যঋষি মানবের এ সমস্যার মীমাংসা করে গেছেন। ঋক্‌বেদে মহর্ষি বশিষ্ঠের উক্তির মধ্যে তা দেখ্‌তে পাই, যখন বশিষ্ঠ বল্‌ছেন "প্রভু, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, তাহলে আমি কোন দুঃখকষ্ট দুঃখ বলে মনে করি নে; কিন্তু তুমি যদি না থাক, তবে যে দুঃখ আমাকে নিপীড়ন করে, তা অবর্ণনীয়"। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকেই সাথী বলে গ্রহণ কর্‌তে হবে, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে;—ক্ষুদ্র মানব সে অমৃতময় লোকের সন্ধান দিতে পার্‌বে না; আর তাঁকেই যদি পথের সঙ্গী বলে গ্রহণ কর্‌তে পারি, তবেই জীবন-পথে নেমে আসবে আনন্দের অফুরন্ত ধারা—যেমন করে নেমে আসে বর্ষার বারিধারা নীল আকাশ বিদীর্ণ করে, যেমন করে নেমে আসে পাষাণ গুহার রুদ্ধ কক্ষ ভেঙ্গেচুরে স্বচ্ছ নির্ঝরধারা! তখন মৃত্যুর অসীম তিমিরাবৃত পথ আলোকিত করে ফুটে উঠ্‌বে বাসন্তী প্রভাতে পূর্ব্বাশার অরুণরাগ; জীবনের যা কিছু দুঃখ, যা কিছু কষ্ট, যা কিছু দৈন্য,—সব নিমেষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ঐন্দ্রজালিকের কুহক-দণ্ডস্পর্শে; আনন্দের অপূর্ব্ব সুষমায় ধরণীর প্রান্ত হতে প্রান্তান্তর অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত করবে, শিশিরবিন্দু-খচিত প্রান্তর-বক্ষে সূর্য্যকিরণের মত জীবনের মরুময় বক্ষে স্বপ্নমাধুরী ফুটিয়ে তুলবে, সফল হবে জীবন-পথের পথচলা, সার্থক হবে মানবজীবন। আর্য্যঋষির এই অপূর্ব্ব অবদান পৃথিবীর বুকে নবীন স্বর্গ সৃষ্টি কর্‌ল।

কালচক্রের অপূর্ব্ব আবর্ত্তনে আর্য্যঋষির উদ্ভাবিত অমৃতলোকের পথ কণ্টকময় গুল্মে আচ্ছাদিত হয়ে গেল, আনন্দের অপূর্ব্ব পাথেয়, আত্মসমর্পণ-যোগরূপ অভিনব উপায় কালবক্ষে লুকায়িত হল। তার স্থলে বেজে উঠ্‌ল খণ্ড দুঃখ-সুখের বাঁশরী; জাগতিক সুখ-সম্পদের লালসাময় ঝঙ্কার। মানব ভুলে গেল অখণ্ডের বাণী, অমৃতের পথ।

কিন্তু চিরদিন সমভাবে কিছুই থাকে না; পরিবর্ত্তন বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম; এক যায়, আর আসে। তমসাবৃত হিমযামিনী চিরদিন সমভাবে বসুন্ধরার শুষ্কতপ্ত বক্ষে স্বীয় আসন বিস্তার কর্‌তে পারে না; ফুটে ওঠে তিমির-রাশি ভেদ করে পূর্ব্বাশার উদয়াচলে দিব্যতেজবিলম্বিনী হেমকায়া উৎফুল্লা উষা—আবার জীবজগতে আনন্দের বাণী বেজে ওঠে।

ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে উপনিষদের যে মহতী বাণী দীর্ঘকাল কোন্ অতল পাথারে লুকায়িত ছিল; যে পথরেখা অদৃশ্য লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল; আবার উপ-নিষদের বাণী, অমৃতময় ব্রহ্মলোকের পথ ও পাথেয়ের সন্ধান এক ব্রাহ্মণ-বালকের মনের কোণে উঁকি মেরে গেল। কেঁদে উঠ্‌ল বালকের প্রাণ পৃথিবীবাসীর দুঃখে ঠিক তেমনি ভাবে, যেমনি ভাবে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিমাচলের পাদমূলে মৃত, রুগ্ন ও বৃদ্ধকে দেখে এক রাজপুত্রের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল জীবের দুঃখ দূর কর্ব্বার জন্য। রাজপুত্র সন্ন্যাসী হয়ে বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বা-ণের সন্ধান পেয়েছিলেন; ব্রাহ্মণ-বালকও দস্যু-তস্করসঙ্কুল বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে হিমগিরি অতিক্রম করে সুদূর তিব্বতে গিয়ে আর্য্যঋষির নবীন পন্থার আবিষ্কার করে নবীনভাবে বাঙ্গালার বুকে ফিরে এসে মুক্তির অপূর্ব্ব বাণী ঘোষণা কর্‌লেন—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

দুর্গা অর্থে দুর্গতিনাশিনী।

(শ্রী..............দেবশর্ম্মা)

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের পর বর্ষা নামিয়া বসুন্ধরাকে শীতল করিয়া দেয়। আবার বর্ষার পর শরৎ আসিয়া ঘন মেঘমালাকে অপসারিত করিয়া দেয় এবং ধরণীকে বিবিধ ওষধির শ্যাম পত্রে সুসজ্জিত করিয়া তোলে। কিন্তু এই শরতেরও প্রারম্ভভাগে বারিধারা সম্পূর্ণ